International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 47520)
Volume-III, Issue-V, June 2017, Page No. 10-37
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

সার্কাসের মেয়েরা

খোন্দেকার দিলসাধ হক
গবেষক, মানবী বিদ্যাচর্চার গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

Circus is of a 'Big Top' with various acts providing entertainment therein. With an improving reputation after civil war and industrial revolution the circus involved larger number of female performers to its show. During this period common people got thrilled to see the risk taken by incredibly skilled women in circus arena. But their contribution and devotion never been well recognized as that of men.

"Any act commonly performed by a man becomes a much greater draw with women performing it". In the accounts of western history contribution of women artists are being prominently mentioned in respect with various field of entertainment but in our culture women artists have often been unremembered and faced challenges , encountered difficulties in choosing their profession and gaining acknowledgement due to mainstream gender biases. Circus is also not an exception. The history of inclusion of women as performer in circus is more complex, with historian disagreeing on its facts and features due to scarcity of biographical information about women circus artists and they remained unofficial in their status. But we must admit that female performers have often been misrepresented or omitted to be recorded in the accounts of historical research. In this article we go through the history of those few women who devoted themselves to this performing art and try to analyse their position from socio- cultural aspect.

Key words: Woman artist, Entertainment, Acknowledgement, Challenges, Performing art

শুরু করব এমন একজন মানুষের জীবন কথা দিয়ে ভারতীয় ও বাংলার সার্কাস শিল্পের এক বিস্মৃত অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নামখানি। শুধু বাংলার সার্কাসই নয় বাংলার থিয়েটার শিল্পকেও সমৃদ্ধ করে গেছেন তিনি। সেই প্রতিভাময়ী বাঙালি শিল্পী রাজবালা দাসীর জন্ম হয় ১৮৮৭ সালে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা[১] (মালোপাড়া) অঞ্চলে। মাত্র চার মাস বয়সে রাজবালা দাসীর মা পুঁটিরানীর মাতৃবিয়োগ হয়। এর কয়েক বছর পরই তিনি তার পিতাকেও হারান। অতি শৈশবাস্থায় বাবা মাকে হারানোর ফলে যা হওয়ার তাই হল। আত্মীয় স্বজনদের প্রতারণায় তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি অর্থাৎ নিজস্ব বাসগৃহটি হাতছাড়া হয়ে গেল। পুঁটিরানীর মোট পনেরোটি সন্তান সন্ততির মধ্যে পরবর্তীকালে মাত্র চারজন জীবিত ছিলেন। এঁরা হলেন বড় বোন হরিমতি, মেজ বোন মতিবালা, দাদা তিনকড়ি এবং সর্বকিনষ্ঠ

রাজবালা। মায়ের মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনদের প্রতারণা আর বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ প্রায় নি:স্ব অবস্থায় এই চার ভাইবোনের দিন কাটতে থাকে। প্রতিবেশিনী সহৃদয় খুদিবালা ওরফে খুদিমাসীই তাঁদের চারজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খুদিবালার কাছে আশ্রয় পেয়ে এই অনাথ শিশুগুলির খাওয়া পরার অভাব কিছুটা মিটল বটে কিন্তু আর্থিকভাবে তারা ছিল সহায়সম্বলহীন। খুদিবালার উদ্যোগে বড়বোন হরিমতির সঙ্গে রামবাগানেরই এক বাসিন্দার বিয়ে হল। মতিবালা, তিনকড়ি ও রাজবালা এরপর রামবাগানে দিদির কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু জীবনের এই নিশ্চয়তাটুকুও তাদের বেশিদিন রইলনা। কারণ বিয়ের অল্প কিছুদিন পরই হরিমতি বিধবা হলেন। স্বভাবতই হরিমতির স্বামীর মৃত্যুতে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা আর রাজবালাদের ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন না। সহায়হীন হরিমতি নিজেই ভাইবোনেদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তিনি তখন তার নিজের আশ্রয়ের খোঁজে ঢাকা চলে যান। রাজবালা সহ তার বাকি দুই ভাইবোন পুনরায় সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েন। আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যেই তাদের দিনগুজরান হতে থাকে।

সহসা একটি সার্কাস কোম্পানির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়। Prof. Bose এর Great Bengal Circus তখন কোকাতায় এসেছে তাদের শো করতে। তাঁর সার্কাস দলের পক্ষ থেকেই সেই সময় অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সার্কাস দলে নেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই সব অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে সার্কাসের নানাপ্রকার ক্রীড়কৌশল শেখানো হত। সহায়সম্বলহীন তিনকড়ি তখন এই বিজ্ঞাপনটি দেখে মতিবালা আর রাজবালাকে নিয়ে সার্কাস দলে যোগ দেন। বোসের সার্কাসই তখন বাঙালির একমাত্র সার্কাস সারা ভারত জুড়ে যারা প্রদর্শনী করছে। 'বোসের গ্রেট বেঙ্গল' সার্কাস নামে খ্যাত এই সার্কাস কোম্পানিটির মালিক সেই সময়ে ছিলেন ২৪ পরগনার ছোট জাগুলিয়া গ্রামের বসু পরিবারের মতিলাল বসু। মতিলালের পিতা ছিলেন সেই সময়কার খ্যাতমান কবি, নাট্যকার বক্তা ও অভিনেতা মনোমোহন বসু। বাঙলা শুধু নয় ভারতীয় সার্কাস শিল্পেই তখন মেয়েরা বিশেষ আসতেন না। সার্কাস, যাত্রা, থিয়েটার কিংবা সিনেমার মত বিনোদনী ধারায় যুক্ত হওয়াটা দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী ছিল। শুধুমাত্র দরিদ্র নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরাই রুজির টানে যাত্রা থিয়েটার বা সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত হতেন। আসলে এগুলি একসময় ছিল সস্তা বিনোদনী রুচির পরিচায়ক। তাই সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেমেয়েরা এ'সকল পেশায় যুক্ত হওয়াটা খুব সমীচীন মনে করতেন না। একপ্রকার বাধ্য হয়েই তিনকড়ি আর তার দুই বোন রাজবালা এবং মতিবালা সার্কাস দলে যোগ দেওয়র সিদ্ধান্ত নেন কারণ হরিমতি ঢাকা চলে যাওয়ার পর তাদের ভবিষ্যৎ হয়ে পড়েছিল একেবারেই অনিশ্চিত। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তাদের সার্কাস দলে আসা কিন্তু পরবর্তীকালে সার্কাস শিল্পীরূপে তিনকড়ি ওরফে তেনা এবং রাজবালা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। আমরা যে ট্রাপিজের খেলাগুলি দেখি, রাজবালা যুক্ত ছিলেন এই ট্রাপিজ শিল্পের সঙ্গেই। ট্রাপিজ ও ব্যালেন্সের খেলায় রাজবালা সে যুগে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। একটি ছোট টেবিলের ওপর পর পর চারটে করে বোতল সাজিয়ে মোট আটটি সমান মাপের টেবিল সাজানো হত। রাজবালা নিচের টেবিলটি থেকে জিমন্যাস্টি দেখতে দেখাতে ব্যালেন্সের ওপর ভর করে ওপরে উঠে আসতেন এবং ওপরের টেবিলে উঠে দেহটিকে সম্পূর্ণ উল্টে ঠিক পরের টেবিলে রাখা প্লেট থেকে চপ কাটলেট খেতেন। সেকালের দশর্করা রাজবালার এই ব্যালেন্সের খেলাটি দেখে বারংবার চমৎকৃত হয়েছেন। আজকাল কোন সার্কাসেই এমন ব্যালেন্সের মাধ্যমে চপ কাটলেট খাওয়ার অভিনব কৌশলটি খেলায় দেখা যায়না।

অতি অল্প বয়সেই রাজবালা গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে যোগ দিয়েছিলেন তাই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তার পেশাগত দক্ষতা, প্রতিষ্ঠা ও দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ক্রীড়াকৌশলগত দক্ষতা এবং চার্তুযে গ্রেট বেঙ্গলের মালিক মতিলাল বিমুগ্ধ ছিলেন। রাজবালার প্রতি শুরু থেকেই মতিলালের সুনজর ছিল। সেই ভাললাগা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে রাজবালার সৌন্দর্য ও ক্রীড়া নৈপুণ্যের দৌলতে। অবশেষে রাজবালার সৌন্দর্য ও গুণে মুগ্ধ হয়ে মতিলাল তার পানিপ্রার্থী হন এবং ১৮৯০ সালে উজ্জয়িনীর সার্কাস সফরে গিয়ে সেখানকার এক কালীমন্দিরেই হিন্দুশাস্ত্র মতে এক পুরোহিতের উপস্থিতিতে রাজবালা এবং মতিলালের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিয়ের পরও রাজবালা সার্কাস দলে খেলা দেখানো কিন্তু অব্যাহত রাখেন। প্রসঙ্গত বিয়ের পূর্বেই রাজবালা সন্তানসম্ভবা ছিলেন। বিয়ের বছরেই অমৃতসরে (১৮ই কার্তিক, ১৩০৫) রাজবালা তার প্রথম এবং একমাত্র সন্তান কন্যা ইন্দুবালার জন্ম দেন। পরবর্তীকালে এই শিশুকন্যাই সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কন্যার জন্মের পর ধীরে ধীরে সার্কাসের প্রতি রাজবালার উৎসাহ ও আগ্রহ কমে আসতে থাকে। ফলে তিনি কোলকাতায় ফিরে আসেন এবং ২১ নং দয়াল মিত্র লেনের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। মতিলাল কিন্তু তখনও ভীষণভাবে সার্কাস অনুরাগী তাই তিনি সার্কাস দল ছাড়লেন না। সার্কাসকে কেন্দ্র করেই দু'জনে মিলিত হয়েছিলেন, আবার সার্কাসই উভয়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়াতে থাকে। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে এক অস্ত্রোপচারের ফলে মতিলালের মৃত্যু ঘটে। আসলে বহুমূত্র রোগের মতো শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও তিনি এই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু শারীরিক ধকলটুকু সইতে পারেননি। মতিলালের মৃত্যুর পর গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের কর্ণধার হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রিয়নাথ বসুর যিনি মতিলালের ছোট ভাই।

বাঙালি তথা বাঙলার সার্কাস দলের অন্যতম প্রতিভাময়ী ও নবীন এ'শিল্পীটির জীবন ছিল একান্ত বর্ণময়। শৈশবকাল থেকেই গানবাজনাতেও রাজবালার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। খুব ছোট বয়স থেকেই শুধু শুনেই কোনো গানের সুর তিনি হুবহু গলায় তুলে নিতে পারতেন। সার্কাস জীবনে তিনি যেমন মহিলা শিল্পীরূপে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তেমন তাঁর সঙ্গীত জীবনটিও ছিল বর্ণময় এবং উজ্জ্বল। আগেই বলেছি ইন্দুবালার জন্মের পরই রাজবালা সার্কাস জীবন থেকে অবসর নেন। তাঁর পরবর্তী জীবনটা কেটেছিল দীর্ঘ সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে। বাংলা পুরাতনী, কীর্তন, ও টপ্পাঙ্গের সঙ্গীতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এখান থেকেই তাঁর পেশাগত জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। একের পর এক সঙ্গীতাসরে তিনি পরম নৈপূণ্যে আর মুনশিয়ানার সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকেন। সার্কাস শিল্পী হিসাবে তার জীবন শুরু করলেও রাজবালা জীবনের সুদীর্ঘ সময় কাটান সঙ্গীত চর্চাতে। রাজবালার বৈবাহিক জীবন সার্কাসেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিবাহের বছর তিনেক পরই মতিলালের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্কের ক্রমেই অবনতি শুরু হয়। কন্যা ইন্দুবালাকে নিয়ে শুরু হয় তাঁর জীবনসংগ্রামের আর এক নতুন অধ্যায়। কখনও সিমলা স্ট্রিটে কখনও বা ২৪ নং দয়াল স্ট্রিটের বাড়িতে বসবাস করা শুরু করেন রাজবালা। মতিলালের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব হ্রাস পায়নি। তাই সংসারযাত্রার ব্যয়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একপ্রকার বাধ্য হয়েই সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করলেন রাজবালা। ইন্দুবালার প্রতি মতিলালের পিতৃস্নেহ থাকলেও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটির উন্নতি কোনোদিন ঘটেনি। কন্যা ইন্দুবালার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মতিলাল মাঝে মধ্যেই রামবাগানের বাড়িতে আসতেন। কিন্তু সাংসারিক দায়িত্বভার কোনদিন কাঁধে তুলে নেননি। ধ্রুপদাঙ্গের গানে রাজবালার হাতে খড়ি হয়েছিল মতিলালের হাতেই। তখন কেবল সখের বশেই গানটা শিখেছিলেন। আদৌ ভাবেননি যে এই সঙ্গীতই একদিন তার ধ্যানজ্ঞান এবং আর্থিক সংকট মোচনের উপায় হয়ে দাঁড়াবে। ধ্রুপদাঙ্গের গানের প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো পরিশীলিত করতে রাজবালা এবার বাড়িতে ওস্তাদ রেখে নিয়মিত রেওয়াজে মন দিলেন। সেকালের অন্যতম সেরা পাখোয়াজ বাদক ওস্তাদ দুলী ভট্টাচার্য্য রাজবালার গানে সঙ্গত করতে নিয়মিত আসতেন। সঙ্গীত জগতে রাজবালার খ্যাতি ও যশ ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল। গোবিন্দ প্রসাদ মিশ্র, গোবিন গুরু, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীবাবু ছোট ও বড় দুলী খাঁ, লছমী প্রসাদ সিংহ, কেশব প্রসাদ মিত্র, সাতকড়ি ওস্তাদ, গিরিবালার মত বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞেরা তাঁর বাড়ির প্রাত্যহিক সান্ধ্য সঙ্গীত আসরে যোগ দিতে আসতেন। রাজবালার সঙ্গীত জগতে পদার্পণ এবং অচিরেই খ্যাতির শিখরে উত্তরণ তাঁর বহুমুখী প্রতিভারই পরিচায়ক।

শুধু একজন শিল্পী হিসাবেই নয় একজন সমাজকর্মী হিসাবেও রাজবালা স্মরণীয়। বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে একবার এক ভয়ঙ্কর বন্যা হল। তার ত্রাণকার্যে কলকাতার সোনাগাছির মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর্তদের সাহায্যার্থে এঁদের সহযোগিতায় খোলা হল 'ভিখারিনী থিয়েটার'। এই থিয়েটার দলটি বন্যাত্রাণে আর্থিক সাহায্যার্থে উপস্থাপন করল 'রিজিয়া' নাটকটি। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল ত্রাণকার্যে সামিল হওয়া। এরকম সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ নেওয়া বাঙালি মেয়েদের পক্ষে সেকালে তত সহজ ছিলনা। অথচ

এ'কাজে প্রথম এগিয়ে এলেন সোনাগাছি অঞ্চলের মেয়েরা। সোনাগাছির এই ক্রিয়াকর্মে উদবুদ্ধ হল প্রতিবেশী রামবাগান অঞ্চলও। রামবাগানকে বলা হত সে যুগের রূপোগাছি। সোনাগাছির অনুকরণে তারা প্রথম মঞ্চস্থ করলেন 'নরমেধ যজ্ঞ'। রাজবালার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কাঙালিনী থিয়েটার দলের প্রযোজনায় পরিবেশিত হল এই নরমেধ যজ্ঞ নাটকটি। কাঙালিনী থিয়েটার দল প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পরেই 'রামবাগান নারী সমিতি' নামক একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানও তৈরি করলেন তিনি। রাজবালার এই উদ্যোগ নি:সন্দেহ এক ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা। প্রসঙ্গত বলি, নরমেধ যজ্ঞ নাটকটিতে রাজবালা স্বয়ং সমাপ্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সোনাগাছি ও রূপোগাছি তথা রামবাগান অঞ্চলের মহিলা পরিচালিত এই নাট্যদল দুটির মঞ্চ উপস্থাপনের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, নাটকটি অভিনয়ের পূর্বে সোনাগাছির মহিলা নাট্য শিল্পীরা দলবেঁধে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পড়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি (সোনাগাছি) প্রদক্ষিণ করতেন। সোনাগাছির এই প্রদর্শনী কৌশলটি অনুকরণ করেন রামবাগানের মেয়েরাও। তাঁরাও উৎসাহিত হয়ে লাল পেড়ে গেরুয়া শাড়ি পরে নিজেদের অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে বন্যাদুর্গতদের জন্য অর্থ এবং কাপড়চোপড় সংগ্রহ করতেন। সংগৃহীত সামগ্রী এবং অর্থ নাট্যদলের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হত বঙ্গীয় বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারে। সে যুগের সমাজে নারীর উদ্যোগে ওরকম কর্মকাণ্ড এক বিরল নজির। রামবাগান নারী সমিতি গঠন করে (১৯১০ খ্রী:) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতে (বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি, সায়েন্স কলেজ, ৯১ আপার সার্কুলার রোড) যে সাহায্য অর্থ ও দ্রব্য তুলে দেওয়া হয়েছিল (১৯শে অক্টোবর, ১৯৯২) তার উদ্যোক্তাও ছিলেন রাজবালা স্বয়ং।[২] রামবাগান নারী সমিতি রাজবালার নেতৃত্বে ত্রাণ তহবিলে যা কিছু তুলে দিয়েছিল সেগুলি ছিল যথাক্রমে, চাউল ১৫০ কেজি নতুন কাপড় ৩০টি, পুরোনো কাপড় ২৬৪টি, অন্যান্য জামা ৯০টি এবং দুইখানি র‍্যাপার। এ'ছাড়াও মোট সাত কিস্তিতে প্রায় ৯৯৬ খানি শাড়ি, ১৯০টি জামা ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীও গ্রহণ করা হয় বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির তরফে। এই সামগ্রীগুলি গ্রহণ করেছিলেন পি. চ্যাটার্জী। প্রসঙ্গত বলি, রামবাগান নারী সমিতির এই সমাজসেবামূলক কার্যে এগিয়ে এসেছিলেন রাজবালারই সুযোগ্যা কন্যা ইন্দুবালাও। সেকালের শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছিলেন বেঙ্গল আর্টিস্ট এসোশিয়েসন। ২৩ নং ওয়েলিংটন স্ট্রিট, কলকাতা-২৩ এই ঠিকানায়। সম্পাদক ছিলেন শ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্কজ মল্লিক ও মন্মথ মিত্র। ইন্দুবালাও এই এসোশিয়েসনের সভ্য হিসাবে নানা সমাজসেবামূলক কাজকর্মে এগিয়ে আসতেন মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই। রাজবালার রামবাগান নারী সমিতি (২৬ যোগেন দত্ত লেন, কলকাতা), আরো নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মেও এগিয়ে এসেছিলেন সে'যুগে। তাদের নানাবিধ সেবামূলক কাজকর্মের স্বীকৃতি মেলে দৈনিক পত্রিকাগুলিতেই। ২৬ শে নভেম্বর, ১৯২২ খ্রী: 'যুগান্তর' পত্রিকার বিজ্ঞাপনেও রামবাগান নারী সমিতি কার্যকলাপের খবর প্রকাশিত হয়। সেই সময় রামবাগান নারী সমিতি সে ত্রাণকার্যে কিভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তার প্রমাণ মেলে এই বিজ্ঞাপনটি থেকেই। বিজ্ঞাপন তথ্যটি এক্ষেত্রে উল্লিখিত হল।

'উত্তরবঙ্গের/বন্যা পীড়িতের সাহায্যের জন্য/রামবাগান নারী সমিতি কর্তৃক/ কাঙালিনী থিয়েটার/স্টার রঙ্গ মঞ্চ/অদ্য সোমবার ৪ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নভেম্বর/ রাত্রি ৮টায়/১। নরমেধ যজ্ঞ/সমস্ত চরিত্র নারী কর্তৃক অভিনীত হবে/২। ভিক্ষাদান ৩। নির্ধারিত নৃত্যগীত/৪। রেশমী রুমাল।'

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির রিপোর্টেও ''রামবাগান নারী সমিতির সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয় 'রামবাগান নারী সমিতি' যে আন্তরিকতা দেখাইয়া বন্যা সাহায্য কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তজন্য কমিটি তাহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। গতকালও তাহারা স্টার থিয়েটারে অভিনয়লব্ধ ১৭০০ টাকা প্রদান করিয়া দেন। এ'স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অভিনয়ের জন্য যে ৪১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী একাই স্বয়ং দান করিয়াছেন।''

লক্ষ্যণীয় এই সময় ইন্দুবালার বয়স মাত্র তেইশ বছর। কিন্তু মাত্র তেইশ বছর বয়সেই সঙ্গীত জগতে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তার অতি কম বয়সে প্রতিষ্ঠা রীতিমত ঈর্ষনীয়। নারী সমিতি স্বাধীনোত্তর কালেও

নানাবিধ সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েই সমকালীন পত্রপত্রিকায় নারী সমিতির ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে খবর প্রকাশিত হতে থাকে। যুগান্তর পত্রিকা ৩রা চৈত্র ১৩৫৪ মঙ্গলবার প্রকাশ করল – ''গত ২৬শে মাঘ যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আর্য়ুবেদ কলেজ হাসপাতালের জন্য নারী সমিতির কলিকাতায় সাহায্যাভিনয় হইয়াছিল তাহা হইতে উক্ত সমিতির সেক্রেটারী শ্রীমতী ইন্দুবালা, হাসপাতালের অন্যতম সদস্য ও উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত শুভকরণ জালানের মারফত দুই হাজার পাঁচ শত এক টাকা পাঠাইয়াছেন।'' কাঙালিনী থিয়েটার দল প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা থেকে রাজবালা কিছুদিনের মধ্যেই 'দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার' নামক একটি মহিলা নাট্যদল গড়ে তুললেন এবং বলা যায় সে'যুগে রাজবালা প্রতিষ্ঠাত এই নাট্যদলটি মেয়েদের নিয়ে গড়ে তোলা সর্বপ্রথম নতুন একটি পেশাদারী থিয়েটার দল। মূলত মহিলাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পুরোপুরি মহিলাদের অভিনয় সমৃদ্ধ দল হিসাবেই প্রথম বাঙলা ফিমেল থিয়েটারের স্বীকৃতি এদেরই দেওয়া উচিত। মেয়েদের নিয়ে সর্বপ্রথম একটি বাঙলা নাট্য দল গড়ে তোলার গৌরব ও প্রাপ্য মর্যাদা রাজবালার কিছু কম নয়। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ইতিহাসে এ'এক গৌরবজ্জ্বল পর্ব যার অনেকটাই সম্ভবত বাঙালির অজানা। একজন মহিলা কর্তৃক একটি মহিলা নাট্যদল প্রতিষ্ঠার মত উদ্যোগ সেকালের কোন বাঙালি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা কিন্তু দেখাতে পারেননি। রাজবালার নিজস্ব উদ্যোগ ও নেতৃত্বে ১৯১২ সালে রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার নিবেদন করল 'বিল্বমঙ্গল' ও 'হীরের ফুল' নামক দুটি নাটক।[৩] এই নাটক দু'খানি পরিবেশিত হল মনমোহন থিয়েটারে। শুধুমাত্র মেয়েদের অভিনয়ে প্রদর্শিত এই নাটকের টিকিট মূল্য সকালে ছিল দশ টাকা, আট টাকা, ছয় টাকা, পাঁচ টাকা, দুই টাকা এবং এক টাকা। ব্যালকনিতে দুই টাকা এবং এক টাকার টিকিটে কেবলমাত্র মেয়েদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। রাজবালার এই থিয়েটার দলের প্রচারপত্রে পরিচালক হিসাবে দানীবাবুর শিষ্য যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নামটি প্রচার করা হত। এর একটা বিশেষ কারণ হল ফিমেল কালী থিয়েটারটি সম্পূর্ণ মহিলা সদস্য দ্বারা পরিচালিত ও প্রর্দশিত হলেও বিজ্ঞাপনে বা প্রচারপত্রে পরিচালিকা হিসাবে রামবাগান অঞ্চলের মেয়েদের নাম প্রকাশ করাটা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকির বিষয়। যদিও রাজবালার থিয়েটারে যোগীন্দ্রনাথ মহলা ও নির্দেশনার কাজে অনেকখানি সাহায্য করতেন, কিন্তু প্রচারপত্রে কিংবা বিজ্ঞাপনে যোগীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশের পিছনে কাজ করত একটা সামাজিক সংস্কার। কারণ সে যুগে অভিজাত দশর্ক সমষ্টি থিয়েটার বিষয়টিকে কেবল নিজেদের সাংস্কৃতিক কৌলিন্যের অঙ্গ বলেই মনে করতেন তাই থিয়েটারকে নিয়ে এবং থিয়েটারি জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনকে নিয়ে তীব্র একটা শ্রেণিচেতনা কাজ করত। তাই কোনো থিয়েটার পরিচালনার কাজে রামবাগান বা সোনাগাছি অঞ্চলের মেয়েদের যুক্ত থাকার বিষয়টি সামাজিক ও বাণিজ্যিক কারণেই প্রচার করা হতনা।

রাজবালার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ফিমেল কালী থিয়েটার সর্বমোট বারোটি নাটক মঞ্চস্থ করে এগুলি হল: (১) বিল্বমঙ্গল (২) হীরের ফুল (৩) খাস দখল (৪) নরমেধ মঞ্চ (৫) বরুণা (৬) পলিন (৭) হীরে মালিনী (৮) কুঞ্জ দরজী (৯) আলিবাবা (১০) রেশমী রুমাল (১১) পরদেশী ও চন্দ্রগুপ্ত। প্রসঙ্গত বলি, উল্লিখিত প্রত্যেকটি নাটকে রাজবালার কন্যা প্রখ্যাত গায়িকা ইন্দুবালাও অভিনয় করতেন। রাজবালা স্বয়ং কন্যার সঙ্গে মোট ছয়টি নাটকে একসঙ্গে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এগুলি – (১) বিল্বমঙ্গল-এই নাটকটিতে রাজবালা বিল্বমঙ্গল-এর ভূমিকায় এবং কন্যা ইন্দুবালা পাগলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। অন্যদিকে আবার নরমেধ যজ্ঞ নাটকিটিতে রাজবালা রাজা যযাতির ভূমিকায় এবং ইন্দুবালা কাত্যায়নীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। রাজবালার ফিমেল কালী থিয়েটার দলটি যেহেতু সম্পূর্ণ মহিলা শিল্পীর অভিনয়ে সমৃদ্ধ ছিল তাই এ'ক্ষেত্রে যেকোন নাটকেই পুরুষের নাম ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করতেন। অথচ সে কালের প্রচলিত ধারায় কিন্তু সাধারণ ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যাত্রা, থিয়েটারে আসতেন না তাই পুরুষরা অভিনয় করতেন নারী চরিত্রে। ফিমেল কালীর ক্ষেত্রে ঠিক এর উল্টো চিত্রটাই নজরে আসে। আলিবাবার মত অতি জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত এই গল্পটির অবলম্বনে মঞ্চস্থ হল আলিবাবা নাটকটি। সেখানে আলিবাবা হলেন রাজবালা এবং ইন্দুবালা অভিনয় করলেন সাকিনার চরিত্রে। এ'রকম বেশ কিছু নাটক যেমন যেমন খাস দখল (রাজবালা : মোহিত; ইন্দুবালা : গিরিবালা); পলিন (রাজবালা : হাসান এবং ইন্দুবালা

: পলিন)। সেকালের থিয়েটারী সমাজের উপর পুরুষদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। থিয়েটার দলের আর্থিক সংস্থানের জন্য সমাজের বিত্তবান মানুষেরা পৃষ্ঠপোষক রূপে এগিয়ে আসতেন। সেখানে মেয়েদের থিয়েটারী দলের আর্থিক সংস্থানের জন্য এগিয়ে এলেন ব্যবসায়ী বদ্রীদাস ছেত্রী। এছাড়াও রাজবালার পরিবারের বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু জীবনকৃষ্ণ ঘোষও এই থিয়েটারের পরিচালনগত বিষয়ে আন্তরিকভাবে নানা সাহায্য করতেন। ফিমেল কালী থিয়েটারের সুনাম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল কোলকাতা সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও। তাই বেশ কিছু কাল কোলকাতায় অভিনয়ের পর ফিমেল কালী থিয়েটার কোলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই তাদের অভিনীত নাটকগুলির পেশাদারী মঞ্চ উপস্থাপন শুরু করল। কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ফিমেল কালী থিয়েটার সুনামের সঙ্গে তাদের নাটকের প্রদর্শনী করত। রাজবালার উদ্যোগে গোড়ে তোলা ফিমেল কালী থিয়েটারের আর্থিক দায়িত্বভারটি গ্রহণ করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত ব্যবসায়ী বদ্রীদাস ছেত্রী সে কথা তো আগেই বলেছি কিন্তু তিনি যে শুধু আর্থিক দিকটা সামলাতেন সে কথা বললে কম বলা হবে। যে দু'বছর ফিমেল কালী তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল সেই সাফল্যের শরীক তিনিও কারণ সেযুগে এ'জাতীয় মেয়েদের নিয়ে একটা পেশাদারী দল খোলা শুধু ব্যবসায়িক ঝুঁকি নয় সামাজিক ঝুঁকি সেক্ষেত্রে কিছু কম ছিলনা। কিন্তু বদ্রীবাবু মেয়েদের নিয়ে এমন একটি পেশাদারী থিয়েটার খোলার দু:সাহস দেখিয়েছিলেন রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই। বদ্রীদাস ছাড়াও জীবনকৃষ্ণ ঘোষও এই থিয়েটারকে নানাভাবে আর্থিক সহযোগিতা জুগিয়েছিলেন। রামবাগান অঞ্চলের বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের দ্বারা অভিনীত নাটকে সেযুগের সকল শ্রেণির দর্শকের আনুকূল্য লাভ প্রায় অসম্ভব এক কাজ ছিল। কিন্তু অবাঙালি এক ব্যবসায়ী বদ্রীনাথ কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করেই নিজ অর্থ বিনিময়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফিমেল কালী থিয়েটারের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার বিচার এই দুটো বছরের নিরিখে করা সম্ভব নয় কিন্তু রাজবালা কিংবা বদ্রীনাথ ছেত্রীর ব্যতিক্রমী উদ্যোগটি নি:সন্দেহে উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। শুধু তাই নয় বাঙলা ও বাঙালির সংস্কৃতির সাপেক্ষে ফিমেল কালী থিয়েটারের জন্ম ঐতিহাসিক এক গুরুত্বের দাবি রাখে। যেখানে বাঙালি মেয়েদের সাংস্কৃতিক জগতে বিচরণ সেকালে তত সহজ বিষয় ছিলনা সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রাজবালা বাঙালি নারী হিসাবে এক দু:সাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, দুই বছরের এই অস্তিত্বকাল সত্ত্বেও ফিমেল কালী থিয়েটার কিন্তু বিপুল জনপ্রিয়তা এবং জনসমর্থন লাভ করে। এই জনপ্রিয়তা বজাই রাখার পেছনে অবশ্যই বদ্রীদাস ছেত্রীর অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফিমেল কালী দু'বছরে বন্ধ হয়ে গেলেও রাজবালা কিন্তু তারপরও কিছুকাল থিয়েটার করেছিলেন। এমনই এক সময়ে এক বড়সড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল এই থিয়েটার দলটি। খড়গপুরে শো করতে গিয়ে এক বিরাট অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে রাজবালার দল। বদ্রীদাস সেই সময় এগিয়ে আসেন এবং এই বিরাট আর্থিক ক্ষতির সমমূল্যের অর্থ পরিশোধ করে ফিমেল কালীর লোকসান সামলে দেন। বদ্রীদাসের এই অবদানের ফলে সে যাত্রায় ফিমেল কালী থিয়েটার দলটি পরিত্রাণ পেলেও শেষ রক্ষা হলনা। এর কিছুকাল পরেই ফিমেল কালী থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। রাজবালা তবু দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলেন না। ১৯২২-এ প্রতিষ্ঠিত রাজবালার ফিমেল কালী থিয়েটারটির আয়ু ছিল মাত্র দুই বছর। ১৯২৪ সালে রাজবালা পুনরায় নিজেই নাটকে অভিনয় করেন। মডার্ন থিয়েটার নাট্য সম্প্রদায় পরিচালিত নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক (প্রথম অভিনয় ২০শে অগাষ্ট) নাটকে সুলোচনার ভূমিকায় অভিনয় করেন। সুলোচনরা ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি নাট্যপ্রেমী মানুষজনের বিশেষ তারিফ পান।

সার্কাস, সঙ্গীত এবং অভিনয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজবালা তার স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। থিয়েটার যাত্রার জগতে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। অবশেষে ১৯৩৫ সালে বজরংলাল খেমকা প্রযোজিত একটি বাংলা ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। ছবিটির নাম 'রাতকানা'। বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষাতেই ছবিটি প্রদর্শিত হয় এবং রাজবালা এক্ষেত্রে বৌয়ের চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তৎকালীন আজকাল পত্রিকায় রাজবালার অভিনয় প্রসঙ্গে লেখা হল – 'কালো বৌ-এর ভূমিকায় ইন্দুবালার মাতা ভাল' (আজকাল, শনিবার ২৫ শে শ্রাবণ, ১৩৪২ সাল)। সোনার বাংলা, স্বদেশ ইত্যাদি পত্রিকাতেও রাজবালার

অভিনয়ের প্রভূত প্রশংসা করা হয়। এই ছবির মহড়া চলাকালীন খেয়ালী পত্রিকার সাংবাদিক, শ্রী যতীন দাশ এর 'রাতকানা' প্রসঙ্গে বলেছিলেন - শ্রী যতীন দাশের 'রাতকানা'র মহলা জোরভাবে চলছে। চিত্রমোদীদের কাছে এই ছবি সম্পর্কে আমরা একটা মজার খবর জানাচ্ছি। খবরটি হচ্ছে শ্রীমতী ইন্দুবালার মা এই ছবিতে একটি ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য মনোনীতা হয়েছেন। দেখা যাক, এবার মা হারে কী মেয়ে হারে। (খেয়ালী ২৬ আষাঢ়, ১৩৪২)। এই ছবির ভূমিকা লিপিটিও প্রকাশিত হয়েছিল দীপালি পত্রিকায়। দীপালিতে প্রকাশিত (৮ই আগস্ট, ১৯৩৫) রাতকানা ছবির ভূমিকা লিপিটি ছিল এ'রকম -

রাতকানা (বাংলা ও হিন্দীতে Double version)
গল্প - রায় নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
প্রযোজক - শ্রীযুক্ত বি এল খেমকা। আলোকচিত্র ও পরিচালনা - শ্রী যতীন দাশ
উদ্বোধন - রূপবাণী, ৩রা অগস্ট
শ্রেষ্ঠাংশে - শ্রী রঞ্জিত রায়, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, সুহাস সরকার, দুর্নিয়াবালা, ইন্দুবালার মাতা, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি। আজকাল যেমন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কোন ছবির ফ্লিম রিভ্যিউ লেখার চল আছে সে যুগেও এই প্রথা চালু ছিল। তাই রাজবালা অভিনীত 'রাতকানার' ফ্লিম সমালোচনাও বেরিয়েছিল খেয়ালীতেই। এ'প্রসঙ্গে লেখা হয় নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় যার রাতকানায় প্রধান ভূমিকায় রঞ্জিত রায় সুঅভিনয় করেছেন। কিন্তু ১৩৪২ সালের পক্ষে ওর রসিকতা মোটা ও অচল এবং শালা কথাটার ওর বিরক্তিকর আধিক্য আছে। তবু রাতকানা মোটের উপর লোক উপভোগ করবে। দুর্নিয়াবালা, সুহাস সরকার এই সিনেমায় আর অন্যান্য যে সব শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন তাদের কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে বলা হয় যেমন - দুর্নিয়াবালা, সুহাস সরকার, নগেন্দ্রবালা, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, রাজবালা সকলেরই অভিনয় ভালো হয়েছে। শুধু শিল্পীদের সম্পর্কেই নয় চলচ্চিত্রের শিল্প গ্রহণ সম্পর্কেও বলা হয় যে, 'বিদ্রোহী' আর 'রাতকানা' এই দুটিরই শব্দ গ্রহণ ভাল হয়নি। ক্ষোভের বিষয় খুব। বিরতির সময় দর্শকদের জন্য কিছু জলযোগেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই খবরটিও সংবাদপত্র প্রকাশ করতে ভোলেনি। এ'প্রসঙ্গে দীপালিতে লেখা হয়, বিরামকালে নিমন্ত্রিতদের জলযোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়েছে। এই মিষ্টি খবরটি অবশ্য প্রকাশ্য। প্রকাশকের ভাষায় খবরটি শুধু মিষ্টি তা নয় কিছুটা অভিনবও বটে। আজকের দিনে কোথাও এমন শোনা যায় না যে সিনেমা হলের দর্শককে মালিকপক্ষের তরফে বিরতিকালে আহার, পানীয় দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি, রাজবালা সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে অনেক সময়ই সরাসরি তার নাম উল্লেখ না করে লেখা হত ইন্দুবালার মা। এর অন্যতম প্রধান কারণ রূপে বলা যায় যে ততদিনে ইন্দুবালার গায়িকারূপে ভারত জোড়া খ্যাতি। সুপ্রসিদ্ধ এই গায়িকা হয়ত তার মাকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন সুনাম সুখ্যাতির দিক থেকে, তাই সংবাদপত্রে ইন্দুবালার মা বলেই রাজবালার কথা উল্লেখ করত কিছু কিছু পত্রিকা। রাজবালা মাত্র এই এই একটি ছবিই ডাবল ভার্সানে অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে তার যথেষ্ট সুনাম আর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু আর কোনো ছবিতেই অভিনয় করেননি। সেকালের পত্র পত্রিকাগুলিতে নানা সময়ে রাজবালার অভিনয়ের সুখ্যাতি প্রকাশিত হত। রাজবালাকে 'রাজুবালা' নামেও পত্রপত্রিকায় লেখা হত। আসলে রাজবালার ডাক নাম ছিল 'রাজু' তাই অনবধনতাবশত: কখনও কখনও তাকে পত্রিকায় রাজু নামেও সম্বোধন করা হত। যুগান্তর সাময়িকী, রবিবার ২৭ শে জুন, ১৯৮২ ইন্দুবালার জীবিতাবস্থায় শ্রী বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ভুলি কেমনে, আজও সে মনে' শীর্ষক রচনায় রাজবালা নামটিকে ছায়াবালা বলে উল্লেখ করায় প্রতিবাদপত্র পাঠানো সত্ত্বেও এই তথ্যগত ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া হয়নি। রাজবালার মৃত্যু দুই শতকের সাংস্কৃতিক ভাবধারার যোগ সূত্রটি যেমন ছিন্ন করে দেয় সেই সঙ্গে এক কিংবদন্তী বাঙালি মহিলা শিল্পীর বর্ণময় জীবন স্মৃতিটিও ধূসর হতে শুরু করে বাঙালি মনে।

রাজবালার অভিনয় জীবনটি ছিল খুব স্বল্প স্থায়ী। জীবনের দীর্ঘসময়টা তিনি কাটিয়েছিলেন সাংসারিক কাজকর্ম, ধর্মচর্চা এবং সঙ্গীত সাধনার মধ্যে দিয়েই। রাজবালার পরিচয় প্রসঙ্গে যে সচেতনভাবে ইন্দুবালার নাম উল্লেখ করা হত, তার পিছনে ছিল ব্যবসায়িক লাভের উদ্দেশ্য, এ'কথা বিশ্বাস করতেন স্বয়ং ইন্দুবালা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে

অবসর নেওয়ার পর রাজবালা দীর্ঘ অবসর জীবন যাপনের পথ বেছে নেন। রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্র জগৎ কে তিনি খুব দ্রুতই বিদায় জানান। অবসর লাভের পরও তিনি প্রায় তেত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই তেত্রিশ বছরে রঙ্গমঞ্চ কিংবা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তার আর কোন রকম সংযোগই গড়ে ওঠেনি। এ'ক্ষেত্রে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিনোদনী দাসীর জীবন ধারার সঙ্গে রাজবালার অবসর পরবর্তী জীবনটির আশ্চর্য মিল। কারণ বিনোদিনীর মত তিনিও জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু বিনোদন জগত থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। বিনোদন জগৎ সম্পর্কে তিনি একেবারেই মোহমুক্ত হয়ে পড়েন। রাজবালা তাঁর পেশাগত জীবন থেকে যে অবসর নিয়েছিলেন তাঁর আর একটা অন্যতম কারণ হল তাঁর মেয়ে ইন্দুবালা। ইন্দুবালার খ্যাতি তখন দেশজোড়া। মেয়ে তাঁর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই অনুষ্ঠান করার ডাক পাচ্ছেন। মেয়ের একমাত্র অভিভাবিকারূপে তাঁকে মেয়ের সঙ্গেই সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ঘুরে বেড়াতে হত। ফলে ধারাবাহিকভাবে নিজের পেশাগত কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না এবং তিনি আগ্রহ পাচ্ছিলেন না। মেয়ের খেয়াল রাখতে গিয়েই রাজবালা এই আত্মত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। রাজবালার পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং অন্যতম শুভাকাঙ্খী জীবনকৃষ্ণ ঘোষের মৃত্যু ঘটে ৬ই ফাল্গুণ ১৩৬৯ সালে। তাঁর এই প্রয়াণ রাজবালাকে মানসিকভাবে অনেকটা একা এবং অসহায় করে তোলে। রাজবালার সঙ্গে যখন মতিলালের মানসিক দুরত্ব যখন ক্রমশই বাড়তে শুরু করেছিল, রাজবালা কোলকাতায় তখন এই জীবনকৃষ্ণ ঘোষকে পান তার পারিবারিক বন্ধু হিসাবে। জীবনকাকা আমৃত্যু তাঁর আদরের ইন্দুবালার দেখাশোনা করেছেন। রাজবালার পরিবারের সঙ্গে জীবনকৃষ্ণ ঘেষের জীবনটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে রাজবালা এবং ইন্দুবালা মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সার্কাস শিল্প, অভিনয় এবং সঙ্গীত দুনিয়ায় রাজবালা তার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে গেছেন নানাভাবে। কিন্তু সার্কাস পরবর্তী জীবনটা তিনি হয়ত একেবারে বান্ধবহীন অবস্থায় কাটাতেন যদি জীবনকৃষ্ণ ঘোষ তার পরিবারের খুঁটিনাটি সব কিছুর তত্ত্বাবধান না করতেন। রাজবালা তাঁর জীবনে বিভিন্ন বিশিষ্ট গুণী মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। একদা তাঁর গানের মজলিসে আসতেন কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে শিশির কুমার ভাদুড়ি সহ বহু জ্ঞানীগুণী মানুষজন। তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজবালার সংগীতের সপ্রশংস শ্রোতা। সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী রাজবালা বেশ কিছুকাল রোগ ভোগের পর চুরাশি বছর বয়সে ২৭শে ভাদ্র ১৩৭৫ কোলকাতার ২১ নং যোগেন দত্ত লেনের বাড়িতেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এই দীর্ঘ স্বেচ্ছাবসরের জীবন বেশির ভাগই কেটেছে সঙ্গীত সাধনায়। পরবর্তীকালে তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে কন্যা ইন্দুবালার।

উনিবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মতিলাল বসুর গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের আশ্রয়ে উত্থান ঘটে এক বাঙালি মহিলা সার্কাস শিল্পীর। পরবর্তী জীবনে তিনি বাঙলার ফিমেল থিয়েটার দল গড়ে তোলার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারীও হন। প্রতিষ্ঠা পান সে যুগের সঙ্গীত জগতে একজন বিশিষ্ট মহিলা শিল্পী হিসেবে। কিন্তু দু:খের বিষয় বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি জাতি এই অনন্য প্রতিভার অধিকারিণীকে আজও সে ভাবে স্বীকৃতি জানাতে পারেনি। রাজবালার মৃত্যুর পর দুই শতকের সাংস্কৃতিক যোগ সূত্রটি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কারণ তিনিই হয়ত দুই শতকের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যখানি তারতম্যখানি প্রত্যক্ষ করে গেছেন তার দীর্ঘ চুরাশি বছরের জীবনে। পুনরায় ফিরে আসি রাজবালার বর্ণময় অতীত জীবনের কথায় আগেই বলেছি মতিলালের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রাজবালা আর সার্কাসের দুনিয়ায় ফিরে যাননি। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি সরাসরি সঙ্গীত ও নাট্য দুনিয়ায় প্রবেশ করেন। জীবনের শুরুতেই যাত্রার দলে অভিনয় করতে আসার ফলে অতি কৈশোরকালেই রাজবালার অভিনয় শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল। তাঁর পেশাদারী থিয়েটারের কাজ শুরু হয় প্রথম মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ চন্দ্রের শঙ্করাচার্য্য নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। প্রথম অভিনয় ২রা মার্চ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে(১৯০১খ্রী:)। মহড়া চলাকালীন গিরিশ চন্দ্র অবশ্য কলাকুশলীদের সকলকে সম্পূর্ণরূপে প্রশিক্ষিত করতেও পারেননি, কারণ এই সময় শারীরিক অসুস্থতাবশত: কাশী চলে যান। নাটকের কুশীলবদের মহড়াকালীন যাবতীয় পাঠ ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বটি গ্রহণ করেন স্বগীর্য় রাধামাধব বাবু এবং পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য। একমাত্র দানীবাবু কাশী ধামে গিয়ে শঙ্করাচার্যের চরিত্রটি তাঁর পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে আসেন। রাজবালা অভিনীত পেশাদার মঞ্চের দ্বিতীয় নাটকটি হল তপোবল। এই নাটকটিও সেই

সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই নাটকটি যখন রচিত হয় তখনও গিরিশ ঘোষ অসুস্থতার কারণে কাশীতেই। প্রায় দশ মাস পর তাই নাটকটি মিনার্ভাতে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়। ২রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরাজীর ১৯১১ খ্রী: তপোবল নাটকটির প্রথম শো হয় মিনার্ভাতে। রাজবালা এই নাটকে অদৃশ্যন্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। রাজবালা ছাড়াও এই নাটকে অন্যান্য মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী, শ্রীমতী শশীমুখী, পারুবালা, শ্রীমতী নবী সুন্দরী, শ্রীমতী তারা সুন্দরী, শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট), প্রফুল্লবালা। বলা বাহুল্য প্রচুর কলাকুশলী সমন্বিত এই নাটকটির মহড়া চলাকালীনই নাটকটির সাফল্য নিয়ে অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ একপ্রকার হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। কারণ বেদান্ত প্রচারক নীরস শঙ্কর চরিত্রটি যে গিরিশ চন্দ্রের অমৃতময়ী রচনায় এমন প্রাঞ্জল এবং মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে তা কারুরই ধারণা ছিল না। কিন্তু সমস্ত সন্দেহের নিরসন ঘটল যখন অভিনয়ের শেষে দর্শককুল আনন্দে আহ্লাদিত হয় উচ্চ জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করলেন। চৈতন্যলীলার মত শঙ্করাচার্য্য নাটকটিও এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। তপোবল এবং শঙ্করাচার্য্য এই নাটক দুটিতে অভিনয় করে রাজবালা প্রভুত খ্যাতি লাভ করেন। ফলে নাটকেরই সূত্রে তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক পাওয়াও শুরু করলেন। কিন্তু এত সুনাম সত্ত্বেও তিনি কিন্তু মাঝে দীর্ঘকাল, এই জগত থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে 'রৈবতক' নাটকটির মধ্য দিয়ে তিনি পুনরায় ক্ষণিকের জন্য হলেও নাট্যজগতে ফিরে আসেন। বিরতির এই সময়কালে তিনি সঙ্গীতের প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। কন্যার অভিভাবিকা হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াবার সুবাদে নাট্যচর্চার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু প্রায় তেরো বছর পর মডার্ন থিয়েটারে নাট্য সম্প্রদায়ের নাটক 'রৈবতক' এ অভিনয় করতে এসে তিনি বোঝেন এত বছর পরও তার জনপ্রিয়তা এতটুকু ম্লান হয়নি। দীর্ঘসময় যাবৎ নাট্য জগত থেকে দূরে থাকলেও রাজবালা কিন্তু এই সময় নানা জায়গায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে যথেষ্ট উপার্জন করতেন। এই সময় কন্যা ইন্দুবালাও সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। জানা যায় একেবারে কৈশোরকালেই মাত্র আট বছর বয়সে রামবাগান অঞ্চলে মেয়েদের পালাগানের যে দুটি দল ছিল সেই দলে নিয়মিত পালা বা যাত্রাভিনয়ে রাজবালা অংশগ্রহণ করতেন। এই যাত্রাদলের একটিকে বলা হত 'গোলাপী'র দল'। আর দ্বিতীয়টির নাম ছিল 'রাজাহরির দল'। গোলাপী নামক এক মহিলা আর হরিদাসী নামক এক অভিনেত্রী এই দু'জন ছিলেন পালা দলদুটির পরিচালিকা। হরিদাসী রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতেন বলে তার দলকে বলা হত রাজাহরির দল। এই রাজহরির দলেই ১৮৯৩ সালে রাজবালা মাত্র ছয় বছর বয়সে 'গঙ্গা আনয়ন' পালায় ভগীরথের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তিনদিন ধরে এই পালাটি খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশিত হত। বেশ কয়েকবার তিনি এই যাত্রা দলের হয়ে অভিনয় করেন। এর পর তার দাদা তিনকড়ির হাত ধরেই রাজবালা এবং মতিবালা সার্কাস দলে যোগ দান করেন, সে'কথা তো আমরা আগেই বলেছি।

ইন্দুবালার কাছে জানা যায় যে, রাজবালা যখন সার্কাস দলে যোগ দেন শোম্যানশিপ ব্যাপারটা তাঁর বেশ ভালোই রপ্ত ছিল। কিন্তু সেই সার্কাসের জীবন ছেড়ে আসার প্রায় দুই দশক পর তাঁকে আবার অভিনয়ের জগতেই ফিরে আসতে হয়। তবে রাজবালাকে শুধু তাঁর অভিনয় সঙ্গীত কিংবা তাঁর সার্কাস জীবন দ্বারা মূল্যায়িত করলে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হবে না।

মডার্ন থিয়েটার নাট্যসম্প্রদায়ের পরিচালনায় নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক নাটকে সুলোচনার ভূমিকায় অভিনয় করে রাজবালা প্রভূত সুনামের অধিকারী হন। রাজবালার দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু বজরঙ্গলালা খেমকাজী প্রযোজিত একটি মাত্র চলচ্চিত্র 'রাতকানা' ব্যতীত রাজবালা আর কোন ছবি করেননি পরবর্তীকালে।

ছোট একটি উদাহরণ সহযোগে এই কিংবদন্তী শিল্পীর জীবন কথা শেষ করব - জব চার্ণক যে হিন্দু বিধবাকে 'মারিয়া' নাম দিয়ে বিবাহ করেন কিন্তু জব চার্ণকের জীবনীতে, তার সমাধিক্ষেত্রে কোথাওই 'মারিয়া' সম্পর্কে ন্যূনতম তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ বলেন মারিয়ার সমাধিক্ষেত্রটি রয়েছে ব্যারাকপুরে কেউ বলেন - সেটি আছে সুতানুটিতে। বিধবা হিন্দু নারীকে বিবাহের কারণেই জব চার্ণকের পারিবারিক জীবনের ইতিহাস থেকে খুব

সচেতনভাবেই হয় বিযুক্ত রাখা হয় 'মারিয়ার' পরিচয়টুকু। রাজবালাও পারিবারিক জীবনে সেই স্বীকৃতি পাননি। কারণ অতি সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাঙালির সার্কাস' গ্রন্থটি বিশদে প্রিয়নাথ বসু ও মতিলাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেও কোথাও 'বাঙালির সার্কাসে' এই মহিলা শিল্পী তথা মতিলাল বসুর স্ত্রীকে নিয়ে কোন উল্লেখ নেই। খুব সম্ভবত সার্কাসে কাজ করা এক নারীকে প্রিয়নাথ বসুর পরিবার স্বীকৃতি দিতে পারেনি তাদেরই পরিবারের অঙ্গরূপে। এই স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রসঙ্গে বলি, রাজবালার সঙ্গে মতিলালের বা সুশীলা সুন্দরীর সঙ্গে প্রিয়নাথের সম্পর্কে তাদের প্রবল নীতিবোধ সম্পন্ন প্রাচীনপন্থী পিতা মনোমোহন বসু যে মেনে নিতে পারেননি তার পরোক্ষ প্রমাণ মেলে হেমেন্দ্র কুমার রায়ের যাদের দেখেছি (নিউ এজ, বৈশাখ, ১৩৫৮) বইটিতে। এই বইটির প্রথম পর্বে রয়েছে মনোমোহন বসুর প্রসঙ্গটি। হেমেন্দ্র কুমার যখন প্রশ্ন করেন, 'আপনি নাটক লেখা বন্ধ করলেন কেন?' তখন মনোমোহন উত্তর দেন, 'সুরুচির খাতিরে। যেখানে পতিতাদের নিয়ে অভিনয় হয়, সেখানে আমি নেই। .... দেখছেন তো পতিতাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে থিয়েটারের অভিনেতাদের কতটা চারিত্রিক অবনতি হয়েছে?' এমন জবাব হেমেন্দ্র কুমার যুক্তিযুক্তরূপে গ্রহণ করেননি। মনোমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি খানিকটা সমালোচনার আঙ্গিকেই দেখেছিলেন। আসলে মনে হয় পুত্রদের জীবনচর্যার বীতশ্রদ্ধ, ব্যথিত মনোমোহনের পক্ষে রাজবালা কিংবা সুশীলা সুন্দরীদের মত সার্কাস কন্যাদের মানসিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিলনা। ঠিক যেভাবে তিনি মেনে নেননি নাটক থিয়েটারে রামবাগান, রূপোগাছির মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি। খ্যাতনামা পরিবারের সদস্য মতিলালের পক্ষেও কখনোই সামাজিক পিতৃপরিচয়হীন রাজবালাকে প্রথাসিদ্ধ পথে বিবাহ ও স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব ছিলনা। ছত্রিশ বছরের বিবাহিত পুরুষ মতিলাল রাজবালাকে যখন উজ্জয়নীর কালীমন্দিরে গার্ন্ধবমতে বিবাহ করেন তখনই তিনি বহু পুত্রকন্যার জনক এবং রাজবালার বয়স মাত্র এগারো। মাত্র ছ'মাস উনিশ দিনের মাথায় (১৯ শে কার্তিক ১৩০৫/নভেম্বর ১৮৯৮) রাজবালা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। সেই মেয়েটিই পরবর্তীকালে খ্যাতনামা গায়িকা ইন্দুবালা নামে জনপ্রিয় হন। (দ্র: 'অতীত দিনের স্মৃতি', আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৭৯) ইন্দুবালার বয়ান হতে জানা যায় মনোমোহন ছেলেদের এই বিবাহিবর্হিভূত আসঙ্গ মেনে না নিলেও প্রিয়নাথ কিন্তু মতিলাল-রাজবালার সম্পর্কে সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন। কারণ মামা তিনকড়ি দাসের (তেনা) কোলে চড়ে ইন্দু যখন মতিলালের পৈত্রিক বাড়িতে যেত তখন প্রিয়নাথ নাকি সুকণ্ঠী এই শিশুটির বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী করেন 'দাদা ইন্দু দেখো গাইয়ে হবে'। পারিবারিক জীবনে তবু এমন সম্পর্ক নেতিবাচক প্রভাবই ফেলেছিল তাই মতিলালের পরিবার সযত্নে এড়িয়ে গেছে এমন একজন নারীর জীবন আখ্যানটি। অথচ সার্কাসের মেয়ে হয়ে ওঠার পিছনে রাজবালা তো কোনভাবে দায়ী নন। এগারো বছরের একটি মেয়ে যে লড়াই আর যাপনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল সে কথা পারিবারিক ইতিহাসে ঠাঁই না পাওয়াই তো ওদের ভবিতব্য। প্রিয়নাথ কিংবা মতিলালের কথা সগৌরবে আলোচিত হলেও তাই রাজবালার কথাটি আজও রয়ে গেছে ব্রাত্য জীবনের ভাবনায়।

ভারতীয় সার্কাসে আর এক বাঙালি মহিলা শিল্পী তার অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে গেছেন। আদতে এই মহিলা শিল্পী বিশিষ্ট ব্যায়ামবীর শ্রীমতী রেবা রক্ষিত ছিলেন কোলকাতার এক ব্যায়াম প্রশিক্ষণশালার প্রধান বিষ্ণুচরণ ঘোষের ছাত্রী। ভারতীয় সার্কাসে তিনিই প্রথম মহিলা শিল্পী যে বুকের উপর হাতি তোলার মত দু:সাহসিক প্রর্দশনী করে গেছেন ধারাবাহিকভাবে। শুধু হাতিই নয়, জিনিস বোঝাই ভারী জিপগাড়ি কিংবা ভারোত্তলেনের খেলা তিনি দেখাতেন অনায়েসেই। অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা জেলার এক সনাতন হিন্দু পরিবারে ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় সার্কাসের এই কিংবদন্তী শিল্পী। দেশ বিভাগোত্তর পরিস্থিতিতে সপরিবারে তারা চলে আসেন কলকাতায়। ছোট্ট থেকেই আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের চেয়ে তিনি ছিলেন একদম ব্যতিক্রম। শৈশব থেকেই শরীরচর্চার প্রতি তার ছিল বিশেষ ঝোঁক। পরবর্তী জীবনে এই শরীরচর্চার মাধ্যমেই তিনি সংবাদ শিরোনামে উঠে আসেন। কোলকাতার আখরায় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বিষ্ণুচরণ ঘোষের। সেখানে মনোতোষ রায় এবং কমল ভাণ্ডারীর মত ছাত্রদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ শুরু করেন তিনি। এমন এক ব্যতিক্রমী পেশায় তখনকার মেয়েরা সাধারণত আসার দু:সাহস দেখাতেন না। কিন্তু রেবা রক্ষিতের মত মানুষেরা লক্ষ্যে অবিচল। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় রেবা রক্ষিত জিতে

নিলেন 'Miss Bengal for Body Building' খেতাবটি।[৪] এই সময়কাল হতেই তিনি সার্কাসে কাজ করা শুরু করেন। তার প্রর্দশনীর অন্যতম রোমহর্ষক ও আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল বুকের উপর হাতির ভার বহন। এমনতর দু:সাহসিক খেলাটি মহিলা শিল্পী রূপে রেবা রক্ষিতই একমাত্র দেখাতেন। পরবর্তীকালে হয়ত দু'একজন মহিলা শিল্পী এই খেলাটির অনুকরণে প্রদর্শনী করেন। কিন্তু প্রথম এবং বাঙালি শিল্পীরূপে তিনিই এই অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী।

৫০ থেকে ৬০-এর দশকের মধ্যভাগ অবধি সম্মানের সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে এই খেলাটি দেখিয়ে তিনি দর্শককে মনোরঞ্জিত করেছেন। কমলা সার্কাস, ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস ও পরবর্তীকালে জেমিনি সার্কাসে তিনি যুক্ত হন। শুধু সার্কাসেই নয় দুর্গোৎসবে কোলকাতার বিভিন্ন ক্লাবের তরফেও তিনি ব্যায়ামের প্রদর্শনী করতেন। শুধু একজন সুদক্ষ ব্যায়ামবীর নন রেবা রক্ষিত ছিলেন একজন সুনিপুণ নিশানাবাজ। সে'কথা অনেকেরই হয়ত অজানা। সার্কাসের খেলায় বন্দুকের অব্যর্থ নিশানায় তিনি লক্ষ্যভেদ করত পারতেন। সার্কাস থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কোলকাতারই বালিগঞ্জ কালচারাল ইনস্টিটিউটে শরীর শিক্ষার প্রশিক্ষকরূপে তার পরবর্তী কর্মজীবন শুরু করেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন নানাবিধ সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গেও। শিল্প ও সংস্কৃতি জগতে অবদানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক তিনি 'পদ্মশ্রী' সম্মানেও ভূষিত হন। বিরল ও ব্যতিক্রমী প্রতিভার এই অধিকারিণীকে হায়দ্রাবাদের নবাব 'দেবী চৌধুরানী' এই নামেও ভূষিত করেন। ষাট সত্তরের দশকে কোলকাতার দূর্গাপুজা মানেই ছিল পূজোর আসরে অনুরোধের গান তথা লাইভ কনর্সাট আর ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত ব্যায়াম প্রদর্শনী। আর এখানে অবধারিত ভাবে ছিল গড়পারের বিষ্ণুচরণ ঘোষের আখরার সমাদর। বীরঅষ্টমী অর্থাৎ পুজার দ্বিতীয় দিনটি ছিল শক্তির আরাধনার দিন। আর এই উদ্দেশ্যে পাড়ার পুজো উদ্যোক্তারা আয়োজন করতেন Body Building Show। সেখানে মনোতোষ রায়, মনোহর আইচ, রেবা রক্ষিতের মত শিল্পীরা আসতেন প্রদর্শনী করতে। লোহার রড বাঁকানো, চেন ছেঁড়া কিংবা মোটা শক্ত টেলিফোন ডিরেক্টরি তারা ছিঁড়ে দেখাতেন অনায়েসেই। তবে রেবা রক্ষিতের প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তার মাত্রা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। দীর্ঘাঙ্গি, নারী সুলভ পেলবতায় উজ্জ্বল অথচ বিশেষভাবে শক্তিশালী এই মহিলা ব্যায়ামবীর সকল শ্রেণির দর্শকের কাছে ছিলেন বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। নীরদবরণ সরকার, নীলমণি দাশের পাশাপাশি মহিলা শিল্পী হিসাবে রেবা রক্ষিত শরীর চর্চার এক শৈল্পিক ও দু:সাহসিক দিক দেখিয়ে গেছেন। এই সময়কালে মহিষাসুরের মূর্তিও গড়ার শুরু হয়েছিল জনপ্রিয় সব ব্যায়ামবীরদের চেহারার আদলে। সত্তর দশকের সেই সব লৌহ মানবদের আদল এখন আর খুঁজে পাননা কুমোরটুলির শিল্পীরা। এখন সনাতন সেইসব ব্যায়ামবীরদের বদলে ওসামা বিন লাদেন জায়গা করে নিয়েছে অসুরের চেহারায়। আর বাঙলার লৌহমানবী রেবা রক্ষিতের মত শিল্পীরা হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। বাংলার শিল্প সংস্কৃতির জগতে অথচ এই ব্যায়াম চর্চার জন্ম হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে। স্বয়ং বিবেকানন্দ শরীর চর্চার বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। উত্তর কোলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতি সে যুগের যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে প্রবলভাবে কিন্তু আজ বাঙলার ব্যায়াম চর্চার কৌলিন্য তলানিতে এসে ঠেকেছে। ১৮৯৩ সালটা হয়ত আমাদের সকলের স্মরণে নেই, কিন্তু এটি বিশ্ব ব্যায়ামের ইতিহাসে শুধু নয় আপামর ভারতীয়ের কাছে এ'বছরটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই বছরেই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্মসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসীর কাছে ভারতকে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই একই বছরে আধুনিক ব্যায়ামক্রীড়ার জনক Eugen Sandow কলোম্বিয়ার প্রদর্শনীতে তাঁর ব্যায়ামক্রীড়ার মাধ্যমে আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করে নেন। ওই একই শহরে স্বয়ং স্বামীজির ধর্ম সভায় ভাষণ আর Eugen-এর দেহচর্চার মাধ্যমে পাশ্চাত্যবাসীর মন জয় বিশেষ অর্থবহ কারণ স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং যুবসমাজের চরিত্র গঠনে শরীরচর্চার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। একই বছরের একই শহরে দুটি ঐতিহাসিক, স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল সাধারণ মানুষ। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে প্রাচ্য তথা ভারত যে পাশ্চত্যের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে নেই তা যেমন স্বামীজি প্রমাণ করেছিলেন তেমনই সমস্ত যুবশক্তিকে আহ্বান করেছিলেন দেহ তথা শরীরচর্চার মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান

হয়ে উঠতে। ১৮৭৬ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে স্বামীজি স্বয়ং ভর্তি হয়েছিলেন অম্বিকাচরণ ঘোষের আখরায়। এই সময়ই নবগোপাল মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় হিন্দু মেলা'। জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের সাথে সাথে হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যে ছিল যুবসমাজকে শরীরচর্চা তথা ব্যায়াম কুস্তি আখরামুখী করে তোলার। বাঙালির সার্কাস প্রতিষ্ঠার কাজে এই নবগোপাল মিত্রই বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। স্বয়ং স্বামীজি যখন নরেন্দ্রনাথ রূপে পরিচিত তখন Parallal Bar-এর ক্রীড়া প্রদর্শন করেই আখরার তরফে রূপোর প্রজাপতি পুরস্কার পান।

শিকাগো থেকে ফিরে আসার ঠিক পরবর্তী বছরেই কোলকাতার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যায়াম ও কুস্তির আখরা। স্বামীজির আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হল বাঙালি যুব সমাজ। ব্রিটীশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এ শারীরিক শক্তি অর্থাৎ দেহবলের গুরুত্ব যে অপার তা বুঝল বাঙালি সম্প্রদায়।[৫] এমনই এক উৎসাহী বাঙালি কিশোর যিনি পরবর্তী জীবনে প্রবাদপ্রতীম ভারতীয় ব্যায়ামবিদ হয়ে ওঠেন সেই বিষ্ণুচরণ ঘোষ জন্মগ্রহণ করে ১৯০০ শতাব্দীতে। স্থায়ী আখরা থেকে প্রশিক্ষণলাভের পর সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে মানিকতলার গড়পার রোডে নিজের বাড়িতে গড়ে তোলেন ব্যায়াম প্রশিক্ষণ স্কুল। ভারতীয় ব্যায়ামক্রীড়ার জনক বিষ্ণুচরণ ঘোষের উদ্যোগে উনিশশতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যায়ামচর্চার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। বিষ্ণু ঘোষের নিজস্ব একটি সার্কাস অ্যাকাডেমি ছিল সেখানে তার শিষ্যরা নানাবিধ শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন করতেন। কোলকাতার বিভিন্ন কলেজগুলিতেও তার শিষ্যরা প্রদর্শনী করতেন। শান্তি চক্রবর্তী, হিতেন রায়, মধুসূদন পাণ্ডে, জীবন গোস্বামী, সত্য পুল, কমল ভাণ্ডারি, মনোহর আইচ কিংবা মনোতোষ রায় একসঙ্গে বিষ্ণু ঘোষের সব শিষ্যদের নাম বলে শেষ করা যাবেনা। কিন্তু এদের মধ্যে রেবা রক্ষিত মহিলা শিষ্য রূপে ব্যতিক্রম। তিনি তার পুরুষ সতীর্থদের সমকক্ষই ছিলেন। তাদের দলের মনোতোষ রায় ও মনোহর আইচ পান বিশ্বশ্রী খেতাব এবং কমল ভাণ্ডারি পাঁচ দফা পান ভারত শ্রী খেতাব। বিশ্ব পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় রেবা রক্ষিত হয়ত যাওয়ার সুযোগ পাননি। কিন্তু ভারতীয় নারী হিসাবে তিনি প্রথম ব্যায়ামবিদ যিনি সার্কাসের হাতি বুকে তুলতেন নিয়মিত। সেই সময়ের ব্যায়ামবীরদের মধ্যে কমল ভাণ্ডারি আজও জীবিত। অশীতিপর এই মানুষটির স্মৃতিতে উঠে আসে তাদের ব্যায়ামচর্চা আর অতীত জীবনের কথা। প্রতিদিন সোম থেকে শনিবার অবধি তারা চার ঘণ্টা করে অনুশীলন করতেন বিষ্ণু ঘোষের আখরায়। আজ এত বয়সেও তিনি এই অভ্যাসখানি বজাই রেখেছেন। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ড: বিধানচন্দ্র রায় স্বয়ং কোলকাতা মেডিকেল কলেজের অভ্যন্তরে ডাক্তারির ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন ব্যায়ামাগার। ডাক্তার হতে গেলে শুধু পুঁথিগত চর্চা নয় ব্যবহারিক শরীরচর্চার মাধ্যমেও নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করতেন। তাই প্রতিবছর তাঁরই নির্দেশক্রমে ২৪-২৫ শে ডিসেম্বর আন্তমেডিকেল কলেজগুলির মধ্যে আয়োজন করা হত ব্যায়াম প্রতিযোগিতার আসর। বিনয় ভট্টাচার্যের মত একজন প্রথিতযশা শল্যচিকিৎসক নিজে একজন ব্যায়ামবিদ ও ভারোত্তলক ছিলেন। ৯০-এর দশকের সূচনা থেকে ব্যায়ামের প্রথাগত, চিরাচরিত ধারণাখানি বদলে যেতে শুরু করে। বিশ্বায়ন আর অর্থনীতির উদারীকরণের ফলে জন্ম নেয় এক মুক্ত বাজার ব্যবস্থা যার ফলস্বরূপ জন্ম নেয় Multi Gym-এর ধারণা। সেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যায়ামাগার পুরানো আখরার ধ্যানধারণা আমূল পালটে দেয়। বিষ্ণু ঘোষের আখরার সঙ্গে পুরোনো কোলকাতার অনেক আখরায় এইসময় বন্ধ হতে শুরু করে। উত্তর কোলকাতার অগ্রগামী আর ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট-এর পুরোনো আখরার চর্চা অবশ্য এখনও বজাই আছে এর সঙ্গে অবশ্য ওখানে রাখা হয়েছে মাল্টি জিইম-এর ব্যবস্থাও। তবে দু:খের বিষয় এখান থেকে কেউই প্রতিযোগিতা বা প্রদর্শনীর স্তর অবধি পৌঁছাতে পারছেনা। বিগত বছরে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র খেতাব নিয়ে গেছে। প্রাচীন এই শিল্পটি বাংলার বুক থেকে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আজকের আধুনিক সমাজের কাছে শরীরচর্চা হল দামি যন্ত্রপাতির সাহায্যে কিছুটা অঙ্গ সঞ্চালন আর মাল্টি ভিটামিন সমৃদ্ধ দামি খাদ্য গ্রহণ যা অল্প সময়ে বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করবে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত ব্যায়ামবিদের জন্ম দেবেনা। কমল ভাণ্ডারির মত কিংবদন্তী শিল্পীর গলায় তাই আক্ষেপের সুর বাজে। দশ বছর পর এই শিল্পটির অস্তিত্বই আর থাকবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান তিনি। তার মতে শরীরচর্চা হল যেকোন খেলার ভিত্তিভূমি। শরীরচর্চা যথাযথ না

করলে কখনই প্রকৃত ক্রীড়াবিদ হয়ে ওঠা সম্ভব না।[৬] ভারতীয় সার্কাসের সূচনালগ্ন হতেই শরীরচর্চার সঙ্গে এই শিল্পের এক নিবিড় সম্পর্ক। ২০১০ সালে আমরা রেবা রক্ষিতকে হারিয়েছি। তাঁর মত অনন্য শিল্প প্রতিভার জন্ম এই ব্যায়ামশালা হতেই। কিন্তু কোলকাতার পুরোনো ব্যায়ামশালাগুলির দরজা আজ প্রায় বন্ধ কিংবা কেউ কেউ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধুঁকছে। কিন্তু আজও ভুলতে পারিনা সত্যজিত রায় পরিচালিত 'জয়বাবা ফেলুনাথের' সেই দৃশ্যটি যেখানে এক ব্যায়ামবিদ তোপসেকে তার দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন করে শরীরকে মন্দির রূপে আখ্যায়িত করছেন। সেই মন্দিররূপী দেহের শক্তিকে সম্বল করেই রেবা রক্ষিতের মত প্রতিভাময়ীরা সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন একদিন।

"Hindu women are notoriously most timid but (in the person of Sushila ….. who goes through her performance with those animals with nerve and fearlessness, is really strating to witnesss"। ১৯০০ শতকের দৈনিক পত্রিকা ইংলিশ ম্যান-এ প্রকাশিত এই উক্তিখানি তৎকালীন ভারতীয় মহিলা পারফরমারদের উদ্দেশ্যে ছিল।[৭] যারা পুরুষদের সঙ্গে সমদক্ষতায় ট্রাপিজ, ইকুয়েস্টিরিয়ান অ্যাক্ট দেখাচ্ছেন কিংবা বাঘসিংহের খেলা দেখাচ্ছেন, ভারোত্তলন করেছেন কিংবা বুকের চাপে পাথর ভাঙছেন। উনিশশতকের সেই সকল অবিস্মরণীয় পারফরম্যান্সের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যাদের নাম যেমন আভুদা ভাঈ, পারুলেলকার, কুন্নাথ যশোদা, সুশীলা সুন্দরী, মৃণ্ময়ী দেবী, তারাবাঈ, রুগমাবাঈ, ননী, কৌশল্যা, বন্দেহী কুনহী মাথা এবং রাজবালাদেবী। তাঁরা আজ প্রত্যেকেই বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব। সার্কাস শিল্পের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের কৃতিত্ব ও মহিমাও দেশীয় বিনোদনের ইতিহাস হতে লুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে রক্ষণশীল সমাজের ঘেরাটোপ উপেক্ষা করে এই সকল নির্ভীক ও ব্যতিক্রমী মহিলারা পারফরমিং দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন এবং অনন্য কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছিলেন। 'কোম্পানি মেয়ে' নামে পরিচিত এ'সকল মহিলা সার্কাস শিল্পীরা মূলত ছিলেন সমাজের প্রান্তিক ও পতিত সমাজের অঙ্গ। প্রোফেসর প্রিয়নাথ বসুর 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের সদস্যা সুশীলা দেবী, মৃণ্ময়ী দেবী, কুমুদিনি এদের প্রত্যেককেই প্রিয়নাথ 'আমার কন্যা' এই মর্যাদা ও সম্ভাষণ করেন।[৮] বাংলার সার্কাস ইতিহাসে মেয়েদের উত্থানের সঙ্গে প্রান্তিক সমাজের অনুষঙ্গটা জড়িয়ে গেলেও ভারতবর্ষের অপরাপর ক্ষেত্রে সূচনাটা কিন্তু এমনভাবে নয়। কিছু কিছু জায়গায় দেবদাসী সমাজ সার্কাস কন্যার প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করেছে ঠিকই কিন্তু উল্লেখ্য যে ভারতীয় প্রথম মহিলা সার্কাস শিল্পীর আবির্ভাব সূত্রটা কিন্তু এমন নয়।[৯] বিষ্ণুপন্থ মোরেশ্বর ছত্রে তখন ইতালীর চিয়ারনীর সার্কাস কোম্পানিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তার একটি নিজস্ব সার্কাস দল খুলতে চেষ্টা করলেন। প্রথমেই তিনি অনুভব করেছিলেন অন্তত: একজন মহিলা শিল্পী তার দলে থাকাটা জরুরি আর মহিলা শিল্পীর অভাব পূরণে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আভুদাবাঈ পারুলেলকারকে নিযুক্ত করলেন তাঁর সার্কাস কোম্পানিতে। তার স্ত্রীর শিক্ষক-প্রশিক্ষক রূপে তিনি জীবনব্যাপী কাজ করেছেন সার্কাস রিং-এ।[১০] একক ট্রাপিজ অ্যাক্ট ও অ্যাক্রোব্যাটের পারফরম্যান্স ছাড়াও আভুদাবাঈ ভারতীয় সার্কাসের প্রথম মহিলা শিল্পী যিনি সিংহের পিঠে বসে ভারতমাতা সেজে হস্তী পরিবেষ্টিত হয়ে সার্কাস রিং-এ প্রবেশ করতেন। শো শুরুর প্রথমেই সার্কাস রিং-এ ভারতমাতা সেজে আসার এই সংস্কৃতিটি সম্ভবত আভুদাবাঈ-এর সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের হাত ধরে যে স্বদেশী সার্কাস সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল পরবর্তীকালে তা দেশীয় নিম্নবিত্ত মেয়েদের সার্কাসকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেওয়ার পথে দিশা দেখায়।

ভারতীয় সার্কাসে সংস্কৃতির সূচনা লগ্নে মূলত মহারাষ্ট্র, কেরালা ও বাংলা থেকেই সার্কাস শিল্পী তৈরি হওয়া শুরু হয়। প্রথম মালায়ালী মহিলা শিল্পী রূপে কুন্নাথ যশোদার নাম পাই।[১১] কিংবদন্তী সার্কাস শিল্পী কিল্লারী কুনহিকানন শুরু থেকে মেয়েদের সার্কাস শিল্পে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। সার্কাসকে তাদের জন্য একটি নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও সম্মানজনক পেশা হিসাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই যেন এই শিল্পে যোগ্য সম্মান পান তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। ১৯১০-এর সময়কাল থেকে দেশীয় সার্কাস রিং-এ মহিলা শিল্পীদের সংযুক্তি বাড়তে থাকে। এ'প্রসঙ্গে বলি, অবিসংবাদী এক মহিলা শিল্পী থরা বাঈ-

এর কথা। আদতে আগ্রার বাসিন্দা এই শিল্পী বুকের চাপে পাথর ভাঙতেন এবং চুলে ভারি পাথর বেঁধে দুধর্ষ রোমাঞ্চকর পাররম্যান্স করতেন। পরবর্তীকালে তিনি তার নিজস্ব একটি সার্কাস কোম্পানি খোলেন "Thara Bai Circus" নামে।[১২] সার্কাসের চিরায়ত প্রথা ভেঙে ভারতীয় মেয়েরা যে চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছিল তা পাশ্চাত্য সার্কাস সংস্কৃতির সামনেও নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরেই যেখানে সেই শতকের মেয়েরা প্রান্তিক মর্যাদায় বিবেচিত হত সেখানে ভারতীয় মহিলা সার্কাস শিল্পীরা এমন একটি কঠিন অথচ সৃজনশীল বিনোদনী আঙ্গিককে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে ভারতীয় সার্কাসকে এক অন্যমাত্রায় উন্নীত করে। তৎকালীন ভারতীয় সার্কাস সংস্কৃতিও মহিলা শিল্পীদের পেশা ও জীবিকার প্রশ্নে তাদের জন্য একটা সামাজিক সম্মান ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। উনিশশতকের ভারতীয় সার্কাসে মেয়েদের সেই সম্মানজনক অবস্থানের প্রভূত অবনমন ঘটেছে এই একবিংশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু সার্কাস শিল্পে। এখন সার্কাস কোম্পানির মেয়ে বলতে সেই সম্মান, সেই আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটা অবলুপ্ত। পেশার স্বীকৃতির প্রশ্নটিও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঔদাসীন্যে তলানিতে এসে ঠেকেছে। সুশীলা দেবী, মৃণ্ময়ী দেবী, থরাবাঈ কিংবা রুগমা বাঈ-এর মত প্রবাদপ্রতিম কিংবদন্তী শিল্পীদের ঠাঁই কেবল ইতিহাসের পাতায়। ভারতীয় সার্কাসে এখন আর উৎকর্ষ ও প্রতিভা নিয়ে তৈরি হচ্ছেনা তাদের মত কোন মহিলা শিল্পী।

ভারতীয় সার্কাসের সূচনা পর্বে সার্কাসে মেয়েদের যুক্ত করার কাজটা মোটেও সহজ ছিলনা। শুরুর দিকে সার্কাস মালিকরা মহিলা সার্কাস শিল্পীদের কোনরকম দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না যাবতীয় দায়িত্ব নিতে হত ট্রুপ লিডারদের। কোম্পানি কোন মেয়েকেই নিজ সংস্থার তত্ত্বাবধানে রাখতেন না। বাবাসাহেব ভেঙ্কটরাও দেভাল যিনি দেভাল সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই প্রথম এই অচলায়তন ভাঙার চেষ্টা করলেন।[১৩] যদিও আমরা জানি প্রোফেসর প্রিয়নাথ বসু অনেক আগেই তার গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে মহিলা শিল্পীদের একটা সম্মানজনক জায়গা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই যুগেও কিন্তু এই প্রয়াস আবদ্ধ ছিল কেবল বাঙলার মধ্যেই। বাঙলার বাইরে অবশ্য বিষ্ণুপন্থ ছত্রে তাঁর স্ত্রীকে সার্কাস রিং-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এ'ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে তারা ছিলেন উদ্যোক্তা। কর্মী হিসাবে নয়, বরং মালিকের স্ত্রী হিসেবে বিষ্ণুপন্থ ছত্রের স্ত্রী ছত্রে'স সার্কাসে খেলা দেখাতেন। তবে সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রথম দক্ষিণী সার্কাস সংস্কৃতিতে একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলেন ভেঙ্কটরাও। এই পরিবর্তন একটি সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ছিল সে যুগের প্রেক্ষিতে। এক জটিল ও কঠিন পরিবেশের মধ্য থেকে মেয়েদের একটা সুরক্ষিত ও নিরাপদ জীবন দিতে ভেঙ্কটরাও এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেভাল-এর নিজের গ্রাম মহিশালে সেই সময় রমরমিয়ে চালু ছিল দেবদাসী প্রথা। গ্রামীণ সুপ্রাচীন দেবী ইল্লাআম্মার (Ellamma) মন্দিরে গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলি একটি কন্যা সন্তানকে সমর্পণ করতেন দেবী ইল্লাম্মার নামে। শৈশবকাল হতেই এই সকল মেয়েরা তার পরিবার, আত্মীয় বন্ধুদের সংস্পর্শ থেকে দূরে দেবদাসী হওয়ার উদ্দেশ্যে জীবন অতিবাহিত করত তাদের আবাস হতো মন্দির অঞ্চলে। তাদের দেখভালের দায়িত্ব থাকত অপরাপর বয়স্ক ও প্রবীণ দেবদাসীদের উপরে। ধর্মের নামে তৈরি হওয়া এই প্রথাটি আসলে মেয়েদের চরম অসম্মান ও শোষিত জীবনের আখ্যান। যৌবনকালে তারা ছিল সম্ভোগের উপাদান। আর বার্ধক্যে পৌঁছে এরা কাটাতো চরম দারিদ্রের ও দুর্দশার জীবন। অনেকেই শিকার হত নানা রোগ ব্যাধির। কৈশোর ও যৌবনাবস্থায় দেবদাসীদের কেনাবেচা চলত একেবারেই পশুপাখির মতহ। মুম্বাই ও কোলকাতার যৌনপল্লিতে তাদের বিক্রি করা হত সরাসরি। দেভাল চেষ্টা করলেন সার্কাসের মাধ্যমে এদের সামাজিক পুর্নবাসন দিয়ে এই দুষ্ট সংস্কার হতে তাদের মুক্ত করতে।[১৪]

তাঁর এই সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপে নানা প্রেক্ষিত থেকে এলো নানা বাধা। সেই যুগের দেবদাসী প্রথা সরাসরি বন্ধ করা সম্ভব ছিলনা কিন্তু বালাসাহেব চেষ্টা করলেন এই দুষ্টচক্রে আবদ্ধ কিশোরী মেয়েদের উদ্ধার করতে। অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর সংকল্পে ছিলেন স্থির। যে সকল প্রবীণ দেবদাসীদের অধীনে এই সকল কিশোরী মেয়েদের রাখা হয়েছিল বালাসাহেব সরাসরি যোগাযোগ করলেন তাদের সঙ্গে। আর্থিক মূল্যের বিনিময়ে প্রবীণদের অধীনে থাকা অল্পবয়সী মেয়েদের মুক্ত করে নিয়ে এলেন নিজের সার্কাস কোম্পানিতে এবং

তাদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নূন্যতম শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যয়ভার এবং তাদের প্রশিক্ষণবাবদ সমস্ত খরচের দায়িত্ব নিয়ে তিনি সার্কাসের দুনিয়ায় তাদের প্রশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন। সার্কাসের দুনিয়ায় ঢুকে এই সকল সহায়সম্বলহীন মেয়েরা এক নতুন দিশা খুঁজে পেল যেন। যে সামাজিক অসম্মান আর কলঙ্ক ভারটি তাদের এতদিন বহন করে চলতে হচ্ছিল, নতুন এক জীবিকার সন্ধান পেয়ে সেই ভার খানিকটা হালকা হল। সার্কাসের প্রশিক্ষণ লাভ করে ভবিষ্যৎ জীবনে এঁরা অনেকেই সার্কাস শিল্পীরূপে খ্যাতি লাভ করেন। শুধু তাই নয় সমকক্ষতার বিচারে এবং আর্থিক স্বীকৃতির প্রশ্নে তারা পুরুষের সঙ্গে সেই যুগে একই মর্যাদাও লাভ করেন। এই সকল মহিলা সার্কাস শিল্পীদের কোম্পানির মেয়ে ("Company girls") নামে অভিহিত করা হত।[১৫] এই সকল কোম্পানি মেয়েদের সঙ্গে অনেক সময় সার্কাসের পুরুষ শিল্পীরা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন। শুধু পুরুষ সার্কাস শিল্পীই নয় সার্কাসের বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত নন এমন পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এইসব কোম্পানি মেয়েদের। আজও তারা আমাদের কাছে 'কোম্পানির মেয়ে' নামেই পরিচিত কিন্তু সেই সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতি কোনটাই আজ আর তাদের নেই। সার্কাসের অভ্যন্তরে তাদের নিজস্ব ঘর গড়বার এবং সংসার যাপনের একটা প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা থাকলেও বর্হিজগতে কোন সাধারণ পরিবারের সঙ্গে 'কোম্পানি মেয়ে' তথা মহিলা সার্কাস শিল্পীর স্বাভাবিক উপায়ে সম্পর্ক স্থাপনের আবহ আজ আর নেই। একসময় সার্কাসের হাত ধরেই সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত হওয়া দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের কিশোরী মেয়েরা মূল সামাজিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিল, সঙ্গে পেয়েছিল আর্থিক সুরক্ষাও কিন্তু আজকের সার্কাস মেয়েদের জন্য সেই সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়না।

বালাসাহেব ভেঙ্কটরাও-এর এক ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টার ফলে সামাজিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত, স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত কিছু বিপন্ন নারীর একধরনের সামাজিক পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল সার্কাসের আশ্রয়ে। ভারতীয় সার্কাসের ইতিহাসে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির একক অন্য কাহিনি যার নেপথ্যে লুকিয়ে আছে হয়ত মেয়েদের সামাজিক বঞ্চনা আর শোষণের চিরাচরিত ছবিটা। সামাজিক সংস্কার, প্রথা আর পিতৃতন্ত্রের পেশী বলে মেয়েরা সেখানে অবদমিত, শোষিত ও ভোগ্যপণ্যের সামিল। বালাসাহেবের এ'উদ্যোগ নি:সন্দেহে তাই তাদের মুক্তি পথের দিশারী। ভবিষ্যৎ অবমাননার জীবন থেকে মুক্তি পথের দিশা সে-সময়ে ভারতীয় সার্কাস তাদের দেখিয়েছিল। একটা সুরক্ষিত ও নিরাপদ জীবন নাগালে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই পেশা বেছে নিতে তাই নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা দ্বিধা করেনি। বালাসাহেবের উদ্যোগ তাই নজির সৃষ্টি করে গেছে। বালাসাহেবের এই মহৎ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ পুরুষ শিল্পীর সঙ্গে একই মঞ্চে সার্কাসের রিং-এ আগমন ঘটে মহিলা সার্কাস শিল্পীদের। কিন্তু শুরুর এই প্রেক্ষাপটটি ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে বিশশতকের চারের দশকের সময় থেকেই। মেয়েরা এই পেশার আশ্রয়ে নিজেদের মুক্ত হওয়ার যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই প্রেক্ষিতটি ক্রমেই পালটাতে শুরু করে এই সময় থেকেই। শুধু অঞ্চলভিত্তিকভাবেই স্থায়ী কোম্পানিগুলিতে শিল্পীর যোগান সীমাবদ্ধ আর রইল না। বরং পার্শ্ববর্তী দেশগুলি থেকে সার্কাস আর্টিস্ট ও শিক্ষানবীশ আর্টিস্টের আদান প্রদান শুরু হয়ে গেল। শুধু আর্টিস্টই নয় সার্কাস কর্মীর যোগান আসা শুরু হল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি ও দেশ থেকে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নেপাল।

ভারতীয় সার্কাসের তাঁবুতে বহু সংখ্যায় নেপালীরা আসা শুরু করলেন প্রহরী, রান্নাকর্মী, বাদক কিংবা সার্কাসের সহযোগী কর্মী হতে। প্রাথমিকভাবে অবশ্য তারা সার্কাস কর্মীর কাজে নিযুক্ত হলেও ধীরে ধীরে নিজেদের আগ্রহ ও ইচ্ছার দ্বারা সার্কাসের ক্রিয়াকৌশল শিখতে শুরু করেন এবং একদিন রিং-এ আত্মপ্রকাশ ঘটে পারফরমার হিসাবে। কেউ কেউ আবার সরাসরি আর্টিস্ট হিসাবেই বহি:দেশ হতেই আমাদের দেশে এসেছেন। যেমন বলতে পারি ভীম বাহাদুরের কথা - নেপালী এই ভারোত্তলক ১৯৫০ সালে কমলা থ্রি রিং সার্কাসে যোগ দেন পারফরমার হিসাবেই।[১৬] কিন্তু নেপালী মেয়েদের আগমনের পেছনে রয়েছে অন্য আর এক গল্প। মালায়লী সার্কাস আর্টিস্টরা যখন উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রদর্শনীর জন্য যেতেন তখন নেপাল আর সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে একটা যোগ সূত্র তৈরি হত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মালায়লী ভারতীয় সার্কাস শিল্পীর সঙ্গে নেপালী পরিবারের মেয়েরা বৈবাহিক

সূত্রে আবদ্ধ হতেন। কেউ কেউ আবার দরিদ্র নেপালী পরিবারের শিশু ও কিশোরীদের পোষ্যরূপে সার্কাস তাঁবুতে নিয়ে আসতেন এবং এ'ভাবেই ভারতীয় সার্কাসে পারিবারিক ও বৈবাহিক সূত্রে নেপালী মেয়েদের আবির্ভাব হয় বিশশতকের ছয়ের দশকের দ্বিতীয়ভাগে। প্রসঙ্গত বলি, এই সময় ভারতীয় সার্কাসের রিং হতে মালায়লী মহিলা শিল্পীদের অপসারণ শুরু হয়। অধিকাংশ মালায়লী মহিলা শিল্পীরা আসতেন সাধারণত উত্তর কেরালার থাল্লাসেরী ও কুন্নর জেলা থেকে। তখন ওই সব অঞ্চলে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেভাবে বিস্তার হয়নি। ফলে পড়াশুনার সুযোগ ও কাজ পাওয়ার তেমন কোন সুযোগই তৈরি হতনা। ফলে অর্থনৈতিক দুর্বলতা আর বৃত্তির প্রয়োজনেই মালায়লী ছেলে মেয়েরা সার্কাসের কাজে আসতে বাধ্য হতেন। সার্কাস মালিকরাও তাদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া শুরু করেন বিশশতকের শেষের দশকে। বিশেষভাবে শোষণের শিকার হন মহিলা শিল্পীরা। তাদের দারিদ্র আর সহজ সরল চিন্তাভাবনার সুযোগ পূর্ণমাত্রার গ্রহণ করেন সার্কাস মালিকেরা। প্রথমত তাদের যথাযথ অঙ্কের মাস মাহিনা দেওয়া হতনা। বছরের পাওনা ছুটিছাটা থেকেও বঞ্চিত রাখা হত। মাসের পর মাস বছরের পর বছর বিরতিহীনভাবে তারা কাজ করে যেতেন কোম্পানির জন্য। এমনকী কোন কোন কোম্পানি মালিক অনেক সময় দলের মেয়েদের দেশের বাড়িতে তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগও দিতেন না। এমন আচরণের মূল উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির অভ্যন্তরে মেয়েদের শোষণ আর দুর্দশার চিত্রখানি যেন বর্হিজগতের সামনে প্রকাশ না পায়। দীর্ঘদিন ঘরের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে পরিবারের লোকজনেরাই পরবর্তীকালে তাদের সন্তানদের ফিরে পাওয়ার তাগিদে আইনের দ্বারস্থ হওয়া শুরু করে। শুরু হয় পুলিশী হস্তক্ষেপেরও। Habeas Corpus Petition[১৭] দাখিলের মাধ্যমে তারা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই সকল কোম্পানি মালিকদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয় ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ পেতে শুরু করে সার্কাসের অন্দরের কাহিনীটি।

স্বাধীনতার পরে ভারতের সার্কাস দুনিয়ার চালচিত্রে কিছুটা পরিবর্তন আসে। তৎকালীন ভারত সরকার সেই সময় দেশের সর্বত্র শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে সর্বত্র সাধারণ শিক্ষালাভের একটা সুযোগ তৈরি হয়। বিভিন্ন পক্ষবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প ও কলকারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ, কল-কারখানায় কাজের সুযোগ লাভ এবং পরিকল্পনার বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে। মালয়লী মেয়েদের সার্কাস রিংএ-নিয়োগ বন্ধেও এই আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বদল এক অন্যতম কারণ হিসাবে পরিগণিত। একদিকে শিক্ষার সুযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসম্ভাবনা বৃদ্ধি যেমন মালয়লী মেয়েদের সার্কাসের কাজে আসার পথখানি অনেকটা সংকুচিত করেছিল তেমনই সেই সময় কোম্পালিগুলিতে মহিলা শিল্পীর একটা অভাব তৈরি হচ্ছিল। আর এই অভাব পূরণে সার্কাস কোম্পানিগুলি শুরু করল বিকল্প পথের অনুসন্ধান। মহিলা পারফরমারদের অভাব পূরণে তারা প্রতিবেশী রাজ্য নেপাল থেকে ছেলেমেয়েদের আনা শুরু করল। যোগানদার অঞ্চল হিসাবে নেপালকে বাছার প্রধান কারণ হল নেপাল ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতে কোনরকম ভিসা, পাসপোর্টের আইনি প্রতিবন্ধকতা ছিল না এবং আজও নেই। ফলে নেপাল-ভারত চলাচলের অবাধ সুযোগ ছিল। এই সুযোগটাই কাজে লাগালো সার্কাস কোম্পানিগুলি। দ্বিতীয়ত ভারতীয় অর্থের মূল্য নেপালের অর্থমূল্য অপেক্ষা বেশি ছিল। বিশশতকের তিরিশ চল্লিশের বছরগুলিতে নেপালের অবস্থা ছিল ঠিক কেরালার মতই। নেপালের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নেতিবাচক দিকগুলিই ভারতীয় সার্কাসে বাধ্যতামূলকভাবে নেপালী ছেলে ও মেয়েদের কাজের পরিসর তৈরি করে। ছোট ছোট নেপালী ছেলেমেয়েদের ভারতীয় সার্কাস তাঁবুতে আনাটা আরো বেশি সহজ হয়ে দাঁড়ালো যখন বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত নেপালী সার্কাস পারফরমাররা এজেন্ট হিসাবেই সার্কাস কোম্পানির তরফে কাজ শুরু করলেন। তাদের এজেন্সী নেপালী ছেলেমেয়েদের আনার ক্ষেত্রে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করল। পরবর্তী সময়ে অবশ্য অন্যান্য স্থলে কর্মরত লোকজনও এজেন্টের কাজ শুরু করে। শতাধিক নেপালী ছেলেমেয়েকে নেপালের Hettoda অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হত কোলকাতায়। দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে থাকা এই সব ছেলেমেয়েদের প্রথমে রাখা হত কোলকাতায় তাদের প্রধান কার্যালয়ে। এখান

থেকে চাহিদা অনুযায়ী পাঠিয়ে দেওয়া হত কোম্পানির ক্যাম্পে। ভারতীয় সার্কাসের ইতিহাসে কেরালার থাল্লাসেরী অঞ্চলটির ঠিক যে অবদান, নেপালের Hettoda অঞ্চলটিও সার্কাস শিল্পের সাপেক্ষে এই একই গুরুত্ব বিস্তার করেছিল নেপালে। ভারত-নেপাল যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা চলাচলের শিথিতলতার জন্য বহুসংখ্যক নেপালী ছেলেমেয়ে সীমান্ত পেরিয়ে কাজের সন্ধানে যোগ দিত ভারতীয় সার্কাস কোম্পানিতে। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকদের মতে নেপালীদের দৈহিক গঠন জিমন্যাস্টিকস্ শিক্ষার উপযুক্ত নয়। কোন ধরণের রোমাঞ্চকর খেলাগুলির প্রতিও তারা বিশেষ আগ্রহী নয়। কিন্তু নেপালী খেলোয়াড়দের বিশেষ গুণটি হল, শিক্ষার্থী হিসাবে এঁরা অত্যন্ত বাধ্য। প্রশিক্ষকের প্রতিটি নির্দেশ পালনে এঁরা সব সময় তৎপর।[১৮] প্রশিক্ষক যে কৌশল শেখান সব সময় তা অনুকরণে এরা প্রস্তুত থাকেন, তাই দৈহিক সীমাবদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও, যে কোন প্রকার খেলা শেখানোর কাজটা প্রশিক্ষকের পক্ষে সহজ হয়। এ'প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় জেমিনি সার্কাসের মহিলা পারফরমার বাসন্তী কুমারীর কথা। আদতে নেপালের Hettoda অঞ্চলের মেয়ে। দীর্ঘসময় কাজ করে গেছেন ভারতীয় সার্কাস কোম্পানিতে। একাধিক কলাকৌশল ও কসরৎ প্রদর্শনে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন এই নেপালী মহিলা। ফ্লাইংট্রাপিজ, স্ট্যাচু অ্যাক্রোবাট, সাইকেল-এর খেলা, রকেট ট্রাপিজ অ্যাক্ট প্রদর্শনে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। ফ্লাইং ট্রাপিজ প্রদর্শনের সময় তিনি দেড়বার সামারসলট করতেন এবং সেই সঙ্গে করতেন টুইস্ট ক্যাচ-এর কসরৎ, যেটি সাধারণভাবে মেয়েদের জন্য করা ছিল খুব কঠিন কাজ। বাসন্তী কুমারী এই ক্রীড়াগুলি অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে দেখাতে পারতেন। তাঁর এই অ্যাক্টটি অনেক বিদেশী মহিলা শিল্পীও সেই যুগে করে দেখাতে পারেননি।

ভারতীয় সার্কাসে যেমন মালয়লী মহিলা শিল্পীদের অংশগ্রহণ হার সামাজিক ও শিক্ষাহার বিস্তারের কারণে কমেছিল, অন্যদিকে আবার তাদের শূন্যস্থানের যোগ্য দাবিদার রূপে উঠে এসেছিল নেপালী মহিলা পারফরম্যাররা। বিশশতকের শেষ দশকে এদের চাহিদা ও কদর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সার্কাস মালিকদের কাছে তারা পছন্দের তালিকায় প্রথমে থাকার অন্যতম বিশেষ কারণও ছিল। নেপালীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশী ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ছিলনা। কোনরকম সামাজিক চাপ ও হুমকি মেনে চলতে হতে হতনা এক্ষেত্রে। পরিবার ও অভিভাবকরা স্বেচ্ছায় তাদের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্য কোম্পানির হাতে তুলে দিতেন ফলে পুলিশ কিংবা বিচার ব্যবস্থার রোষের/ শাস্তির মুখে পড়তে হতনা কোম্পানিকে। কাজেই নেপালী শিল্পীদের নিয়ে তাঁরা তুলনায় নির্ভাবনায় কাজ করতে পারতো। তিন থেকে পাঁচ বছরের চুক্তিতে এইসব নেপালী ছেলেমেয়েদের নিয়োগ করা হত। প্রত্যেকের মাস মাইনার অঙ্কটি লেখা থাকত তাদের চুক্তিপত্রে। চাকরিতে নিয়োগের পূর্বে কিছু অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হত তার এজেন্ট কিংবা তার পরিবারকে। যেহেতু নেপালী ছেলেমেয়েদের নিয়োগের বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন কোনপ্রকার আইনি বাধা দান করতনা ফলে মালয়লী ছেলেমেয়ে অপেক্ষা নেপালীদের নিয়োগ ভারতীয় সার্কাসে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেল। বিগত শতকের আটের দশকের মধ্যভাগ হতেই ভারতীয় সার্কাসে নেপালী মেয়েদের নিয়োগ প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। নেপালীদের জন্য বিশেষত: নেপালী মেয়েদের জন্য ভারতীয় সার্কাস রিং এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত তৈরির দিশা দেখায় এই সময়ই। অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও ভারত-নেপালের মধ্যে কোনপ্রকার বিধি নিষেধ না থাকায় এ'দেশে কোন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণপূর্বক আর্থিক আয়টুকু নেপাল তথা নিজ দেশে পাঠানোও খুব সহজ ছিল। ফলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে নেপালী সার্কাস আর্টিস্টরা এ'দেশের কোম্পানিতে কাজ করে নিজের গ্রামে অর্থ পাঠাতে পারতেন। ভারত-নেপাল যাতায়াত পথ তো ছিল অবাধ ও মুক্ত, সে কথা আগেই বলেছি। ভারতীয় সার্কাসে মেয়েরা যে সব অর্থনৈতিক ও সামাজিক চলক দ্বারা নির্দেশিত হয়ে এসেছিল, সেই নিয়ামক, নিয়ন্ত্রণমূলক উপাদানগুলি আজও বর্তমান কিন্তু বদলেছে উনিশ- বিশ শতকের মহিলা সার্কাস শিল্পীর গৌরবময় আসনটুকু। একসময় মেয়েরা ভারতীয় সার্কাসে সম্মান ও শৌর্যের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। সেই গরিমা আজ আর অক্ষুন্ন নেই।

এবার বলব ভারতীয় সার্কাসের আর এক অবিসংবাদী মহিলা শিল্পীর কথা যিনি শুধু ভারতীয় নয় বিশ্ব সার্কাসের ইতিহাসে মহিলা পশু প্রশিক্ষক হিসাবে এক অনন্য কৃতিত্বের সাক্ষর বহন করে গেছেন আমৃত্যুকাল। তিনি হলেন মাধবী দেবী। 'টাইগারকুইন' রূপে প্রসিদ্ধ এই মহিলা শিল্পী ছিলেন একাধারে বন্য জীবজন্তুর প্রশিক্ষক এবং

প্রদর্শনকারী। কমলা সার্কাসে কৈশোরকাল থেকেই তিনি খেলা দেখাতে শুরু করেন। বন্য জীবজন্তুর খেলায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করলেও মাধবী দেবী আসলে ছিলেন একজন অলরাউন্ডার সার্কাস পারফরমার। ভারতীয় মহিলা ফ্লাইং ট্রাপিজ শিল্পীদের কাছে তিনি ছিলেন অন্যতম পথ প্রদর্শক। ফ্লাইং ট্রাপিজের সঙ্গে স্টান্ট সাইকেল অ্যাক্টেও ছিলেন সমান দক্ষ। তার প্রশ্নাতীত দক্ষতা আর পারদর্শিতায় ভারতীয় সার্কাস বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে সেই সময়ে। সার্কাস রিং-এ খাঁচা বন্দী হিংস্র বন্য বেড়াল বা বাঘটিকে যখন নিয়ে আসা হত তিনি অবলীলায় খাঁচার ভেতর প্রবেশ করে তাদের পিঠ চাপড়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। কখনও আবার বন্য বিড়ালটিকে কাঁধে তুলে নিতের আহ্লাদবশত:। দীর্ঘদিন তিনি পশু প্রশিক্ষক ও বন্য পশুর ক্রীড়া প্রদর্শক হিসাবে কমলা সার্কাসে কাজ করে গেছেন সুনিপুন দক্ষতায়। কখনও কোনভাবে তিনি কিন্তু বন্য জীবজন্তু দ্বারা আক্রান্ত হননি, এমনই ছিল তার নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা। তাঁর এই অবদান তৎকালীন অনেক মহিলা শিল্পীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মাধবী দেবীর মত শিল্পী ভারতীয় সার্কাসে শুধু নয় বিশ্ব সার্কাস সাপেক্ষে বিরল। এমন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারিনী কমলা সার্কাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সার্কাস জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং কেরালার থাল্লাসেরীতে মুকুন্দান ও কমলার পরিবারেই আমৃত্যু জীবন অতিবাহিত করেন।

কমলা সার্কাসের আর এক অবিসংবাদী মহিলা আর্টিস্ট ছিলেন সারদা দেবী। কেরালার থাল্লাসেরী অঞ্চল-এর কোল্লাসেরী গ্রামের মেয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বেশী বিদেশী দশর্ককে তার পারফরম্যান্সের মহিমায় মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। দীর্ঘাঙ্গী হাসি খুশি ছিপছিপে চেহারার এই মেয়েটি অসাধারণ দক্ষতায় দেখাতেন ট্রাপিজের খেলাগুলি। তবে তিনি পারদর্শী ছিলেন একাধিক খেলায়। ওয়ার ডান্সিং, স্টান্ট সাইকেলিং কিংবা অশ্বক্রীড়ায় তার নৈপুন্য ছিল অসাধারণ। ভারতীয় সার্কাস শিল্পে তৎকালীন সময়ে যে কয়েকজন মহিলা শিল্পী যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে সারদাদেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি ছিলেন অতি দক্ষ এক অশ্বারোহী। শো চলাকালীন তাঁর আইটেমগুলির সময় দর্শক যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে থাকতেন। সারদা ও তার সহযোগী শিল্পী মুকুন্দন একত্রে তিনটে ঘোড়া নিয়ে দেখাতেন Pyramid act। দুর্ধষ মানব পিরামিড সহ তারা একে অন্যের উপর ভর করে দেখাতেন রোমাঞ্চকর সব ব্যালেন্সের খেলা। সারদাদেবী তাঁর প্রদর্শিত প্রতিটি খেলাতেই ছিলেন বিশেষ পারঙ্গম তাই তাকে কেবল একজন ট্রাপিজ আর্টিস্ট কিংবা শুধু একজন অশ্বক্রীড়াবিদ বললে ভুল মূল্যায়ন হবে। একই সঙ্গে একাধিক দক্ষতার সমন্বয় ঘটেছিল তার মধ্যে। কমলা সার্কাসের সুবর্ণ দিনগুলির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সারদাদেবীর নামটি। তাঁর পারফরম্যান্স ও কলাকৌশলগত পারদর্শিতা তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা শিল্পীর স্বীকৃতি দেয়। পেশাগত দক্ষতা ছাড়াও, ব্যক্তি মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ গুণী ও দরদী। শিশুদের সঙ্গে তাঁর ছিল দারুণ সখ্য। ছোটদের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। সার্কাস কোম্পানিগুলি চুক্তির ভিত্তিতে কাজের জন্য থাল্লাসেরী অঞ্চলের অনেক শিশুকে নিয়ে আসত সার্কাস তাঁবুতে। এই সব শিশুদের জন্য কোনপ্রকার প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ ছিলনা। সারদাদেবী স্বেচ্ছায় তাঁর দলের এইসব সার্কাস শিশুদের লেখাপড়ার দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে। কাজের সময় ব্যতীত যেটুকু অবসর মিলত সেই অবসর সময়টুকু তিনি ব্যয় করতেন শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে। একদিকে রিং-এর পারফরম্যান্স অন্যদিকে আবার শিক্ষকের দায়িত্ব পালন – এমন সমন্বয় ভারতীয় সার্কাসের দুনিয়ায় এক বিরল দৃষ্টান্ত।[১৯] ভারতীয় সার্কাসে মেয়েদের সংযুক্তি ও অবস্থানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন গরিমার গল্পটিও। একজন মহিলার হাত ধরেই কিন্তু প্রথাগত শিক্ষার পাঠ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিল কমলা সার্কাসের খুদে শিল্পীরা। মাত্র ১০ বছর বয়সেই সারদাদেবী শুরু করেছিলেন তার সার্কাস জীবন। ছোট্ট একটি সার্কাস দলে যোগদান করেন তিনি শৈশবাস্থাতেই। কমলা সার্কাসে তাঁর নিযুক্তি ঘটে ১৯৪৩ সালে। ঠিক এই সময়ে কমলা সার্কাস বিদেশে প্রদর্শনীর প্রস্তুতি নিচ্ছে। দীর্ঘ দুই দশক তিনি সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন কমলা সার্কাসে। অবশেষে প্রফেসর দামোদরনের মৃত্যুর পর ১৯৬৬ সালে তিনি কমলা সার্কাস ত্যাগ করেন। শিল্পীর শেষ জীবনটা অবশ্য খুব কষ্টে কেটেছিল। কমলা সার্কাস ছাড়ার পর তিনি এক অর্থে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন। অতি নিকট আত্মীয় স্বজনেরা তাঁর পৈতৃক ভিটেখানি বে-আইনি দখলদারির মাধ্যমে তাকে গৃহহীন করে দেয়। শেষ বছরগুলি

তিনি একটি অনাথ আশ্রমে কাটাতে বাধ্য হন। ২০১১ সালে পঁচাশি বছর বয়সে এই প্রথিতযশা শিল্পীর জীবনাবসান হয়। সারদাদেবী ভারতীয় সার্কাস কে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন কিন্তু শিল্পীর শেষ জীবনটুকু কেটেছে অবহেলা আর অনাদরেই। সারদাদেবীর মৃত্যু ভারতীয় সার্কাস গগনে যেন এক নক্ষত্র পতন।

দক্ষিণ মালাবার অঞ্চলের তিরুর গ্রামের আর একটি মহিলা শিল্পী যার সাইকেল স্ট্যান্ট এক সময় মুগ্ধ করেছিল দেশী বিদেশী প্রতিটি সার্কাসমোদীকে তিনি হলেন ননী দেবী। কমলা সার্কাসের এই রত্নটিকে ইউরোপীয় ও আমেরিকার সার্কাস দলের তরফেও তাদের কোম্পানিতে কাজের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু হাজার প্রলোভনেও তিনি কিন্তু কমলা সার্কাসের জমি ছেড়ে যেতে রাজি হননি। দাঁতে একটি রুমাল চেপে ধরে ননী দেবী সাইকেলের এক চাকা হতে অন্য চাকায় তার ভার সঞ্চালন করতেন অবলীলায়। সাধারণ দর্শক স্তম্ভিত হয়ে দেখত তার এই চমৎকার ক্রীড়াটি। যেন মনে হত তাঁর শরীরের উপর মাধ্যাকর্ষজ বল কোনভাবেই ক্রীড়া করছেনা। দৈহিক ভারটি নিয়ে তিনি এমনভাবে সাইকেলের উপর সঞ্চালন করতেন যে বিদেশী শিল্পীরাও ভারতীয় এই মহিলা শিল্পীর ক্রীড়া দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। শুধু স্টান্ট পারফরমারই নন, ননী দেবী ছিলেন কমলা সার্কাসের গ্ল্যামার গার্ল। কোন শহরে কমলা সার্কাসের তাঁবু পড়লেই, শহরের মানুষ দূরদূরান্ত হতে ছুটে আসতেন ননী দেবীর খেলা দেখার জন্য। উন্মুখ দর্শক অধীরে আগ্রহে অপেক্ষা করতেন ননী দেবীর আইটেমটি প্রত্যক্ষ করার জন্য। তার সমসাময়িক মালাবারের তিরুর গ্রামের আরও পাঁচ মহিলা শিল্পী কমলা সার্কাসেই কাজ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে ওদের চলত সুপ্ত এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় সার্কাস অঙ্গনে আবির্ভাব ঘটে আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের। নাম থরাবাঈ। আদতে আগ্রার বাসিন্দা এই মহিলা পারফরমার কার্লেকর ও পরশুরামের Lion Circus-এর শিল্পী হিসাবে সে যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ভারোত্তলনসহ জিমন্যাস্টিক্স-এর বেশ কিছু কৌশল তিনি দেখাতেন অসাধারণ দক্ষতায়। 'The Strong Woman' নামে খ্যাত এই মহিলা শিল্পী শারীরিক শক্তি প্রদর্শনের বিচিত্র সব খেলা দেখাতেন সার্কাসের রিং-এ।[২০] কখন তার বুকের উপর দুজন পুরুষ সহশিল্পী হামানদিস্তার সাহায্যে পাথর ভাঙতেন, কখনও আবার তিনি নিজের চুলে পাথর বেঁধে বৃত্তাকারে ঘোরাতেন। চুলের সাহায্যে ট্রাকের মত ভারি যানবাহন টানার দু:সাহসিক নজিরও তিনি সৃষ্টি করে গেছিলেন। বেশ কিছুকাল নানা সার্কাস কোম্পানিতে কাজ করবার পর তিনি নিজ উদ্যোগে নিজেরই একটি সার্কস দল খোলেন। মালাবার অঞ্চলে একাধিকবার তার দল প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। এই অঞ্চলে তিনি নিজেও অত্যধিক জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন নিজ প্রতিভার গুণে। থরাবাঈ-এর মত শিল্পী ভারতীয় সার্কাসে বিরল।

বিশশতকের শেষের দশকে ভারতীয় সার্কাসে আগমন ঘটে আর একটি অবিস্মরণীয় প্রতিভার। তিনি হলেন রুগমা বাঈ। প্রথম জীবনে তিনি পরশুরাম লাইওন সার্কাসে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে স্বামী রামচন্দ্র রাও-এর সাহায্যে রুগমা বাঈ নিজস্ব একটি সার্কাস দল খোলেন ম্যাঙ্গালোরে। তার এই নিজস্ব সার্কাস কোম্পানিটির নাম ছিল 'রুগমা বাঈ সার্কাস'। অন্ধ্রপ্রদেশের এই মহিলা সার্কাস শিল্পী নিজেকে একজন সার্কাস উদ্যোক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। রুগমার সঙ্গে রাও-এর পরিচয় এক সার্কাস কোম্পানিতেই। রাও তখন Lion Circus-এর জেনারেল ম্যানেজার আর রুগমা Sandow Artist। এখানেই পরস্পরের আলাপ। রাও-এর পরিবার সার্কাসের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। তিনি নিজে Oxford University তে পড়াশুনা করেছেন। সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া তার জীবনে এক আকস্মিক ঘটনা। সেবার Mangalore-এ চলছে পরশুরামের Lion Circus। এই সার্কাসের প্রর্দশনী দেখে মুগ্ধ হলেন রাও। আকৃষ্ট হলেন এই শিল্পকলাটির প্রতি। সার্কাসকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিলেন। এই সার্কাসের জগতেই দাম্পত্যের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করলেন রুগমা বাঈ-এর সঙ্গে। প্রথম স্ত্রী গত হয়েছিলেন বেশ কিছুকাল পূর্বেই। প্রসঙ্গত বলি রুগমা বাঈ-এর তৈরি দলটি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে

এবং গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সার্কাস কোম্পানিগুলির মধ্যে স্থান দখল করে নেয়। ভারতীয় মহিলা সার্কাস সংগঠক রূপে রুগমা বাঈ-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সার্কাসের আবহকে সম্বল করেই অনেক মানুষ সারা জীবনটাই কাটিয়ে দেন। সার্কাসই হয়ে ওঠে তাদের সংসার, ঘরবাড়ি। যেমন বছর ষাটেকের কল্যাণী পোদ্দারের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য - জীবনের এই সবকটা পর্বই অতিবাহিত হয়েছে সার্কাসে তাঁবুতে। মাত্র নয় বছর বয়সে সার্কাসে খেলা দেখানো শুরু করেন কল্যাণী দেবী। সার্কাসেই শুরু সাংসারিক জীবনের। তার সন্তানেরাও বড় হয়েছে সার্কাসের তাঁবুতে। এখন আর তার খেলা দেখাবার বয়স নেই। তিনি তাই এখন সার্কাসের ট্রেনার গার্ডের ভূমিকায় রয়েছেন। শুধু ট্রেনার নয়, সন্তান স্নেহে তত্ত্বাবধান করেন বাইরে থেকে আসা এই মেয়েদের। ভালমন্দ রেঁধে খাওয়ানও ওদের আবদার রাখতে। ওঁর কাছেই জানা গেল, ওঁরা যখন খেলা দেখাতেন, সেই সময় সার্কাসে কেবল থাকা খাওয়ার সুযোগ মিলত। নগদ অর্থে কোন পারিশ্রমিক পেতেন না ওরা। এখন অবশ্য এই চিত্রটা অনেকেটাই বদলেছে। এখন যারা খেলা দেখাতে এসেছেন তাঁরা দৈনিক ৩০০ টাকা করে পান খাওয়াদাওয়া সহ।[২১] খেলা অনুযায়ী রেট বাড়ে। এছাড়া যে যত বেশি সুন্দর দেখতে সেই অনুযায়ীও রেট বাড়ে। যারা ভাল খেলা দেখাতে পারে, মাস গেলে ১৫-২০ হাজার টাকা অনায়েসেই রোজগার করতে পারেন আজকাল। ওভারটাইম বাবদ চার হাজার টাকাও বাড়তি রোজগার সম্ভব হয় বাড়তি সময় কাজের জন্য। নিপুণ হাতে পালং চিকেনের তত্ত্বাবধান থেকে শুরু করে মেয়েদের রিং-এর জন্য প্রস্তুত করা, সব কাজেই কল্যাণী দেবীর সমান স্বাচ্ছন্দ্য। সার্কাসের মেয়েরা তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছে আজ। তাই এই জগতকে ঘিরে কল্যাণী দেবীর কোন খেদ নেই।

আদতে গুজরাটের অধিবাসী রিবু সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছে দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ।[২২] তার সার্কাস জীবনে যুক্ত হওয়ার গল্পটা একটু অন্যরকম। সেবার 'বোম্বে সার্কাসের' প্রদর্শনী এসেছে ওদের গ্রামে। সপরিবারে খেলা দেখতে গেছেন রিবুও। শো চলাকালীনই খেলা দেখতে দেখতে ওর ভাল লেগে যায় সার্কাসের এক ট্রাপিজ শিল্পীকে। ঝুলন্ত দড়িতে সে তখন নানারকম খেলা দেখাচ্ছিল। মেয়ের পছন্দকে মান্যতা দিয়েই রিবুর পরিবার ছেলেটির বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে। উভয় পরিবারের সম্মতিতে ২০০৩ সালে তাঁবুর সামনেই বিয়ের মণ্ডপ সাজিয়ে, পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে মন্ত্র পড় বিয়ে হয়ে যায় গুজরাটি রিবুর। সার্কাসের সবাই সেদিন উপস্থিত ছিল ওদের বিয়ের মণ্ডপে। রিবুর ইচ্ছা ছিল বিয়ের পর গুজরাটের রাজকোটে ফিরে যাবে। সেখানে সে বাচ্চাদের নিয়ে নতুন বাড়ি কিনে ঘরসংসার সামলাবে, আর তার স্বামী খেলা দেখাবে সার্কাসে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। এখন তিনি নিজেই সার্কাসের আর্টিস্ট। এখন রিবু পাখি আর কুকুরের খেলা দেখান আর অবসর সময়ে মেয়েকে লেখাপড়া শেখান। একই সঙ্গে সামলান সংসারের দায়দায়িত্বও। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্র্যাকটিস সেরে বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, তারপর স্নান সেরে মেয়েকে নিয়ে রোদ পোহানো। এই নিয়মের অন্যথা হয়না। কারণ ঠিক ১টায় শো শুরু। তার আগে যাবতীয় কাজকর্মগুলি সেরে নিতে হয়। রাতের শেষ শো চলে ৯টা অবধি। তারপর সবার ছুটি। যে যার মত অবসর যাপনের সুযোগ পান। রিবু ও তার মহিলা সহশিল্পীরা সাধারণত এই অবসরটুকু কাটান সকলে মিলে টিভি সিরিয়াল দেখে। এই বাঁধা ছন্দেই চলে ওদের সার্কাস জীবন। শিকড়হীন অস্তিত্বের মধ্যেও জেগে থাকে ওদের বেঁচে থাকার লড়াই।

ছোট্ট পিংকীর বড় হয়ে ওঠা এই সার্কাসের রিং-এই। মা বাবা দু'জনেই সার্কাস আর্টিস্ট। তাই সার্কাসের চেনা বৃত্ত পিংকীর কাছে খুব একটা দু:সহ ঠেকেনি কোনদিন। তবে বাবা কোনদিন চাননি যে ওদের মেয়ে রিং-এ পা দিক। পিংকীর মা ছিলেন সাইকেল পারফরমার আর বাবা সাইকেল ট্রেনার। তাই সার্কাসের মধ্যেই ওদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দু'জনেই সার্কাসে কাজ করতেন, তবু সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। আসলে পারিশ্রমিক খুব ভাল ছিল না সেই সময়। সাংসারিক অভাব অনটন ঘোচাতেই বাধ্য হয়ে পিংকী খেলা শিখতে শুরু করেন।[২৩] পিংকীর বাবা সকালের ট্রেনিং শেষ করে বেরিয়ে গেলে, মার কাছে খেলা শিখত সে। মা ছিলেন একজন সাইকেল

আর্টিস্ট। তাই মেয়েকে শেখাতে শুরু করেন সাইকেলের নানা খেলাগুলি। মা বাবা এখন মুম্বাইতে থাকেন। ওদের কথা বলতে গিয়ে বিষাদের সুর নামে গলায়। সার্কাসের মালিক পিংকীকে সন্তানতুল্য স্নেহ করেন। বাবার অবর্তমানে পিংকীও তাকে বাবার মতই দেখে। মালিকের উদ্যোগেই সার্কাসেরই মোটর সাইকেল পারফরমার-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে পিংকীর। ছুটিছাটায় বরের সাথেই পিংকী চলে যান শ্বশুর বাড়িতে। তাঁবুর বাইরে পা রাখলে বোরখা পরে নেন তিনি। পিংকী বলেন - 'আমি যখনই বাড়ি যাই বোরখা পড়ে, না হলে রাস্তায় লোক আমাদের দেখলেই বলে ওই দেখ সার্কাসের মেয়ে যাচ্ছে তখন খুব খারাপ লাগে। অনেক মানুষ সার্কাসে আসে শুধু আমাদের শরীর দেখতে খেলা দেখতে নয়।' পিংকীর এই উক্তি আমাদের আবার কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিল যে, দক্ষতার বিচার নয় বিপণনের অঙ্গ হিসেবেই ব্যবহৃত হয় সার্কাসের মেয়েরা। আর এই কদর্য সত্যটা মেয়েরা নিজেরাও জানেন। ঝলমলে লালরঙা কস্টিউমে, সোনালী চুলের বছর তিরিশের মেয়েটি একচাকায় প্রদক্ষিণ করে চলেছে গোটা স্টেজ। কখনও সাইকেলের উপর দাঁড়িয়ে কখনও বা পা দুটি সাইকেলের উপর তুলে দিয়ে হাত দিয়ে প্যাডেলিং করে; সব শেষে হাত ছেড়ে গ্রুপ প্যাডেলিং করে দর্শককে তাক লাগিয়ে দেওয়া পিংকী খান আর তার মত অন্যান্য সার্কাস কন্যার সামাজিক শিল্পী জীবনের সম্মান এমনই জটিল যে বোরখার আড়ালেই সে একমাত্র নিশ্চিন্ত।

নেপালের হিটড়া অঞ্চলে পরিবারের সঙ্গেই থাকত মেয়েটি। আজ তেইশ বছর হল সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছে। কাকতালীয় ভাবে এসে পড়েছিল সার্কাসের দুনিয়ায়। তার পর আর ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। সার্কাসেই নিজের সংসার পরিবার হয়েছে। সেবার ছোট্ট সাবিনা বেড়াতে গেছিল তার বড় মাসীর বাড়ি। সেখানে দেখে তার মাসির ছেলে ১৬টি মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে সার্কাসের কাজে। সেও জেদ ধরল যাওয়ার জন্য। সার্কাসের অজানা দুনিয়ায় পা রেখে প্রথম এক দু'বছর পরিবারের জন্য খুব খারাপ লাগত। কান্নাকাটিও করত সে। তারপর আসতে আসতে যত বড় হতে লাগল পুরোনো জীবনের কথা, ফেলে আসা পরিবারের কথা সেভাবে আর কষ্ট দিতনা তাকে। বিহার থেকে আসা সার্কাসের এক দড়ির খেলোয়াড়কে ভাল লেগে গেল তার। সেই সার্কাস খেলোয়াড়কেই বিয়ে করে সংসার শুরু করে সাবিনা। বর্তমান তিনটি ছেলেমেয়েই থাকে বিহারে শাশুড়ি, ননদের কাছে। তারা ওখানে থেকেই পড়াশুনা করছে। আর সবচেয়ে ছোট মেয়েটির বয়স এখন মাত্র তিন। সাবিনা বলেন - 'এত দুরন্ত যে ওকে সামলানোর কেউ নেই'। ছয় বছরের হয়ে গেলে তাকেও বিহারে পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আছে সাবিনার। কারণ বাবা মা হিসাবে তারা কেউই চান না যে, ওদের ছেলেমেয়েরা সার্কাসে আসুক। সাবিনা বলেন - 'আমি চাই না সার্কাসের এই জীবনে আমার ছেলে মেয়েরাও আসুক। ওরা পড়াশুনা করে আরো বড় হোক, ভাল কাজ করুক। সার্কাসের এই জীবন ভালো নয়। আমরা চাইনা আমাদের সন্তানরাও সেই জীবন দেখুক'। ত্রিপল দিয়ে তৈরি ১১/১২ ফুটের তাঁবুর সামনে বছর আড়াই-তিনের একটা বাচ্চা মেয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আর খুঁটিতে বাঁধা তাঁবুর দড়ি ধরে ক্রমাগত চেষ্টা চালাচ্ছে ডিগবাজি খাওয়ার। মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে হলে তাকে তাঁবুর দড়ি ছেড়ে পড়াশুনা শিখে বড় হতে হবে। সার্কাসের তাঁবু নয়, অন্য এক ভবিষৎ হয়ত অপেক্ষা করছে তার জন্য, কিন্তু অবোধ শিশুটি সে কথা জানেনা। তাই এই জগতই এখন তার আপনার জগত। সাত বছরের ছোট্ট সাবিনাও একদিন যে'ভাবে আপন করে নিয়েছিল এ'জগতকে।

একুশ বছর ধরে সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছেন নেপালের আশা চন্দ।[২৪] নেপালের মেয়েদের চাহিদা ভারতীয় সার্কাসে বরাবরই বেশি। নেপালেরই এক দাদার হাত ধরে সার্কাসে চলে এসেছিল সে। তারপর দীর্ঘ একুশ বছর এই সার্কাসেই জীবন অতিবাহন। রিং ডান্সার হিসাবে সে এখন সার্কাসের সিনিয়র আর্টিস্ট। এখন আর এ'সব খেলা তাকে প্র্যাকটিসও করতে হয়না। অভ্যাস হয়ে গেছে। রিং-এর খেলা, বলের খেলা, বন্দুকের, খেলায় দীর্ঘদিনে তার একটা দক্ষতা জন্মেছে, তাই এখন অনুশীলন ছাড়াও অনায়েসেই রিং-এ চলে আসেন আশা। কর্মজীবনে একবারই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তিনি। সেবার জিমন্যাস্টিক্স-এর খেলা দেখানোর সময় একটা পাখার মধ্যে আশা ও তার পাঁচ-ছয়জন মহিলা সহশিল্পী ঘুরছিলেন পাখার নবটি খুলে গিয়ে সবাই বিভিন্ন দিকে ছিটকে যায়। সেই দুর্ঘটনার

ফলে আশার পা ভেঙে যায়। সার্কাসের মালিক তার পা-এর অপারেশনের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পা জোড়া লাগল। বেশ কিছুদিন বিরতির পর আবার রিং-এ ফিরলেন তিনি। এবার আর জিমন্যাস্টিক্স নয়। রিং-এর খেলা দেখানো শুরু করলেন। সার্কাসের মোটর সাইকেল আর্টিস্টকে বিয়ে করে সার্কাসেই সংসার পেতেছেন। ঘর বলতে একটা ছোট্ট তাঁবু। তাঁবুর ভিতর একটা ডবল বেডের বিছানা পাতা, একটা হলদে ডুম জ্বলছে। আর বিছানার একপাশে রাখা কয়েকটা রিং। সার্কাসেই ওদের সংসার ওদের জীবিকা। সার্কাস ছেড়ে যাবার কথা কখনও মনে হয়নি। ওরা এখনও দিব্যি নিমেষে রিং-এর ভিতর মাথা গলিয়ে পুরো শরীরটা রিং-এর ভিতর থেকে বের করে আনতে পারেন। সার্কাসের এরেনাটাই এখন তার কাছে সহজ বাস্তব।

নেপালের আর এক মেয়ে লিসাও দেখান রিং-এর খেলা। নেপালের কাঠমাণ্ডুতে তার বাড়ি। সার্কাসে এসে লিসার মত মেয়েরা যেন দারিদ্র থেকে একটু পরিত্রাণ পেয়েছে। লিসা বলেন 'আমি সার্কাসে অনেক ভাল আছি' এখানে আমাদের খাবার দাবারের কোন সমস্যা হয়না। আমাদের জন্য রোজ খাবার তৈরি হয়। মাছ, মাংস, ডিম, যা খেতে চায়, সবই মালিক আমাদের দেন। টাকা পয়সা যা রোজগার করি সব বাড়িতে পাঠিয়ে দিই'। লিসা, পায়েল, আভেরি, শান্তিরা পরম নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছেন যেন সার্কাসে এসে। থাকার হয়ত একটু কষ্ট হয় ওদের। স্বল্প পরিসর তাঁবুগুলিতে দুটো তিনটে করে ক্যাম্প খাট পাতা। খাটের ওপরই মোটা দড়িতে ইলেকট্রিকের তার টেনে ডুম ঝোলানো। লেপ কম্বল বিছানা খাটের শেষে একফালি মেঝে। সেখানেই কেউ কেউ আবার রাতের খাবার আসার আগে পাম্প স্টোভে সাময়িক ক্ষুধা নিবৃত্তির আয়োজন করেন। অন্য তাঁবুতে আবার একদল মত্ত টিভি সিরিয়ালে। প্রত্যেকের দেশ বাড়ি থাকলেও, সকলের ফেরার তাগিদ থাকে না। তবে লিসা বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরবেন। ভাইবোনেদের জন্য তাই জামাকাপড়, বিদেশী পারফিউম, মেক আপ এ'সবই কিনে ফেলেছেন গিফ্ট দেবেন বলে। পরিবারের কাছে ফিরবেন সেই আনন্দে সুটকেসও গোছানো শেষ। শো শেষ হয়ে গেলে রাতের অন্ধকারে ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে তাঁবুর ভিতর জিরিয়ে নেওয়া আর পরের দিনের প্রস্তুতির চিন্তা। লক্ষ্মী, মতি, ঝুমুররা এখন এক অন্য মানুষ। মুখের প্রসাধন নেই। রঙিন পোশাকগুলি ঝুলছে তাঁবুর দড়িতে। আগামী দিনের জন্য তারাও অপেক্ষারত নতুন দশর্ক, নতুন প্রদর্শনীর জন্য।

কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছাকাছি যে এলাকায় আশা থাকতেন সেটি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকা। ক্লাশ ফোর অবধি পড়ে আর এগোনো সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা প্রতি পদে পদে। তাই অচিরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল স্কুলে যাওয়া। ছোট্ট থেকেই ডানপিটে স্বভাবের ছিল মেয়েটি। পাহাড়ের পরিবেশে জন্ম তাই চড়াই-উতরাই ছোটাছুটি করে ছিল অফুরন্ত দম। স্বভাব চঞ্চল মেয়েটি তাই আর বাড়ি বসে থাকতে পারেনি চলে এসেছিলেন সার্কাসের কাজে।[২৫] তাদের এলাকার কিছু মেয়ে সেই সময় সার্কাসে কাজ করতে আসত। তাদের কাছেই সার্কস জগৎ আর ভাল রোজগারের গল্প শুনেছিল সে। তারপরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সার্কাসে কাজ করবে বলে। বাবা মা কে বলল – 'আমাকে সার্কাসে ভর্তি করে দাও'। দরিদ্র বাবা মেয়ের কথায় অমত করলেন না। মেয়ে সার্কাসে গেলে পরিবারে টাকা আসবে, উপরন্তু একটা পেটের খরচও কমবে। মেয়েকে নিয়ে তাঁরা গেলেন সার্কাস কর্তৃপক্ষের কাছে। স্থানীয় বেশ কিছু মেয়ে সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত, তাই তাদের মাধ্যমেই যোগাযোগ হল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার পরে সার্কাসে ভর্তি হয়ে গেল মেয়েটি। পাঁচ বছরের চুক্তি। প্রথমে প্রশিক্ষণ নিতে হবে তারপর রিং-এ নামতে হবে, খাওয়া দাওয়া সহ মাসিক অল্প কিছু টাকা স্টাইপেণ্ড। তাতেই রাজি হয়ে গেল তার পরিবার। শুধু তো খেলা শেখা নয়, পেটের তাগিদেই সার্কাসে আসা। তাই সামান্য কটা টাকার স্টাইপেণ্ড পেলেও চলবে ওদের। এরপর কেরলের ট্রেনার বাবুয়াটার কাছে শুরু হল ট্রাপিজের ট্রেনিং। প্রথম প্রথম খুব ভয় লাগত আর কষ্ট হত। ট্রেনার যখন বলতেন 'যা এবার বার ছেড়ে ওর হাত পাকড়ে নিবি'। তখন ভয়ে চোখ বুজে ফেলত নতুন শিক্ষানবীশ। যেন একবারে পাথর। ট্রেনার তখন কাঁধ ধরে ঝাঁকাতেন বলতেন, 'চোখ বুজলে তো আগেই পড়ে যাবি'। দাঁতে দাঁত চেপে দোল খেয়ে হাত ছাড়তে শিখলো মেয়েটি। না ছেড়ে উপায় তো নেই। খেলা তো শিখতে হবে। সেই জন্যই তো সার্কাসে আসা। এখন অবশ্য ভয় কাটিয়ে অনেক কঠিন খেলা রপ্ত করেছে সে। ইদানীং রিং, বন্দুক, বাস্কেট

বলের খেলাগুলি শিখছেন তিনি। আসলে এই পেশায় যত বেশি খেলা শেখা যাবে, উত্তরোত্তর তত মাইনে বাড়বে। আর বেশি আইটেম জানা থাকলে এক সার্কাস থেকে অন্য সার্কাসে কাজ বদলের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তবে অজন্তা সার্কাসের এই মহিলা শিল্পী সার্কাস বদল করবেন না। কারণ এখানেই তার প্রেম, বিবাহ ও সংসার। স্বামী তেজ চন্দ্রও এই সার্কাসের মোটর সাইকেল আর্টিস্ট। ছেলে সৌরভকে নিয়ে তাদের চলন্ত সার্কাসের সংসার। তবে গ্লোবে মোটর সাইকেল চালানো তেজকে দেখে দর্শক যখন রোমাঞ্চিত হন তখন আর একজন আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। উদ্বিগ্ন থাকেন তেজের আইটেম নিয়ে। সে নিজেও এখন ট্রেনার। নতুনদের ট্রাপিজের ট্রেনিং দেন আশা। তাই আজ আকাশে মাটিতে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বিয়ের পর থেকে এই অভ্যস্ত উদ্বেগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। খেলা শেষ হলে (গ্লোব রাইডিং) গ্লোব থেকে তেজ বেরিয়ে এলেই তবেই মানসিক স্বস্তি মেলে। কাঞ্চনজঙ্ঘার এই মেয়েটি আজ পুরোদস্তুর পারফরমার। তার নিজের সেরা খেলা হল বল বাস্কেট করা। টুলের ওপর প্রথমে বসে ওপরের দিকে দু'পা তুলে পা দিয়ে বাস্কেট বল নাচানো। তারপর এদিক-ওদিক রাখা ছটা ধাপে পর্যায়ক্রমে বল ফেলে পায়ে তুলে শেষে বলটি বাস্কেট করা। কী অসাধারণ দক্ষতায় চলে এই ব্যালান্সের ক্রীড়া। কোনদিন যদি কোন একটা ধাপে বল নিতে গিয়ে সামান্য বিচ্যুতি ঘটে তবে পুরো আইটেমের আকর্ষণটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই খুব সতর্ক থাকতে হয়। মন:সংযোগের একটু গণ্ডগোল হলে ঘটতে পারে বিপত্তি। তাই এই আইটেমটি করার সময় ধীর স্থির শান্ত মন নিয়ে আসতে হয় রিং-এ। সাইকেল আর রিং-এর খেলাতেই সমান পারদর্শী তিনি। আসলে এ সব আইটেমের মূলমন্ত্রই হল ব্যালান্স। ব্যালেন্সের আইটেমগুলি খুব ভাল রপ্ত করেছে সে, তাই একাধিক ব্যালেন্সের আইটেম দেখাতে খুবই পারদর্শী। মধ্য তিরিশের এই শিল্পীর এক একটা ব্যালেন্সের খেলা শিখতে ঠিক এক এক বছর সময় লেগেছে। সার্কাসের হিসাবে তিরিশ পেরোনো বয়সটা কিছু কম না। তবু তার মনে এখনও অদম্য ইচ্ছা নতুন খেলা শেখার। 'আরেকজনের দেখানো খেলা দেখে ইচ্ছা হয় আমিও একটু শিখি না কেন' বললেন অজন্তা সার্কাসের এই শিল্পী আশা চন্দ। শিক্ষানবীশির সেই কষ্টের দিন আজ আর নেই এখন তার নির্দিষ্ট মাসমাহিনা, তার স্বামী তেজও এই সার্কাসে স্থায়ী মাহিনা পান ফলে আর্থিক অনটন কিছুটা হলেও ঘুচেছে।

ছেলে সৌরভ নাগপুর কনভেন্ট স্কুলে পড়াশুনা করছে। ছেলে যেন 'দাদা' সৌরভের মতই হয় এই কামনা তার। ক্লাশ এইটে উঠেছে সে। আশার স্বামী তেজও সার্কাসে এসেছিলেন নিছকই পেটের দায়ে। তার ক্ষেত্রেও বাড়ির লোক এসে চুক্তি করেছিল। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা আশাকে বড় বেশি বিদ্ধ করত প্রথম দিকে। মনে হত যেন নির্বাসিত জীবন যাপন করছে। এক আধটা দিন ছুটি পেলেই তাঁবু ছেড়ে দেশের পথে পা বাড়াতেন মহানন্দে। কিন্তু তখন এলাকার অস্বচ্ছল পরিবারেরা তাদের এই সার্কাসের কাজকে ভাল চোখে দেখত না। এখন আশা ও তার স্বামী প্রতিষ্ঠিত এবং সার্কাসের অন্দরেই একটা সামাজিক, সাংসারিক জীবন যাপন করছে যেমনটা নাকি একটি মেয়ের ক্ষেত্রে সমাজ দেখতে চায়। তাই ওদের গ্রামের মানুষের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। শখ বা ভালবাসায় তেজ বা আশা কেউই আসেননি এ'জগতে। কিন্তু এখানেই ওদের চলমান সংসার। তাঁবুর ভিতরেই ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন আছে ওদের ছোট্ট সংসারে। সার্কাস কর্তৃপক্ষ চাল, ডাল, শুকনো শাক সবজির মাসোহারা দিয়ে দেয় ওদের। তাতেই দুজনের রান্না করেন আশা। তবে এখানে সবাই যেন ওদের পরিবারের মতই, তাই কখনও সখনও অন্যান্য সহকর্মী বন্ধুরাও খান ওদের সঙ্গে পাত পেড়ে। তবে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে হয় এই সংসার নিয়ে, কারণ কোন জায়গায় সার্কাস দুই-আড়াই মাসের বেশি থাকে না। এখন একটু থিতু হতে চান ওরা। দেশে পাকা ঘর বাড়ি করেছেন; ইচ্ছা আছে সৌরভ বড় হয়ে পড়াশুনা শেষ করে যেদিন চাকরিতে ঢুকবে, সেদিন এই যাযাবরের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে দেশের বাড়িতে চলে যাবেন অবসর যাপন করতে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আশার স্বামী, সংসার, সন্তানের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এখন সৌরভকে নিয়ে একটাই ইচ্ছা, সে বড় হোক, ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক। সার্কাসের ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে যাতে সৌরভকে আসতে না হয়, তাই ওর ভাল পড়াশুনার উপর জোর দেন তেজ ও আশা।

অজন্তা সার্কাসে ওদের মতই আরো পাঁচজোড়া স্বামী-স্ত্রী আছেন। সার্কাসের দুনিয়ায় যুক্ত হওয়ার কারণটা ওদের সবার ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক। শখ নয় দারিদ্রই টেনে এনেছে ওদের। তবে প্রত্যেকের অভিমত – 'সার্কাসে এসে ভাল আছেন'। এই জীবন বোধটা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা। তাই লড়াই-এর দড়িটা তারা আরো শক্ত হাতে চেপে ধরেন। আশার পারফরমেন্স কেমন লাগে, এই প্রশ্ন তেজকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল 'খুব মজা লাগে'। প্রতিদিনের ঝুঁকির লড়াইটা ওরা নেন 'মজা' হিসেবেই। তাই তো এই বিনোদনের রথ থেমে থাকে না থেমে নেই ১টা-৪ টে, ৪ টে-৭টা, ৭-টা-১০টায় শোগুলিতে।

সার্কাস প্রসঙ্গে নানা বিচিত্র ঘটনা জানতে জানতে, নানান কাহিনির পড়তে পড়তে আমরা নতুন করে অবাক হই লিণ্ডা সুজার কাহিনিটি জেনে। একজন এরিয়াল পারফরমার বর্তমানে পুরোদস্তুর এই উচ্চপদস্থ কর্পোরেট কর্মী। গ্লোবাল মার্কেটিং, কমিউনিকেশন এবং অ্যাডভাটার্জিং-এ স্নাতকেত্তর ডিগ্রী অর্জনের পরে প্রায় সতোরো বছর কাজ করেন কর্পোরেট দুনিয়ায়। লস এঞ্জেলেসের একটি কর্পোরেট সংস্থায় ভাইসপ্রেসিডেন্ট পদে কর্মরত লিণ্ডা এই কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলেন তার প্যাশন। অত্যধিক কাজের চাপ আর ব্যস্ততা, দৈনন্দিনের যান্ত্রিকতায় কর্পোরেট জীবনকে কোনভাবেই উপভোগ করতে পারছিলেননা লিণ্ডা। ২০১০-এর শেষ দিকে একটি বিজ্ঞাপন নজরে আসে তার। দুটি এরিয়াল্লাশের কুপন পান তিনি এবং সহসা এই নতুন সৃজনশীল বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হন। কর্পোরেট দুনিয়ার একয়েয়মি কাটাতে যোগ দেন এরিয়াল ক্লাশের। লিণ্ডা অনুভব করেন এরিয়াল অ্যাক্ট শুধুমাত্র শারীরিক কলাকৌশলগত দক্ষতার বিষয় নয়, এটি সৃজনশীল এবং যথেষ্ট উপভোগ্যও।

সূচনা দুটি ক্লাসের মাধ্যমে হলেও, শেখার তাগিদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের সংখ্যাও ক্রমে বাড়তে বাড়তে পাঁচটা থেকে দশে দাঁড়ায়। এই ভাল লাগা লিণ্ডার এমন প্যাশনে পরিণত হয় যে তিনি ২০১২ সালে সিদ্ধান্ত নেন আর কর্পোরেট জীবনে পুরো সময় ব্যয় নয়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন সপ্তাহে তিনদিন কাজ করবেন অফিসে, তার বিনিময়ে ৬০% মাহিনা নেবেন, আর বাকি সময়টা ব্যয় করবেন এরিয়াল অ্যাক্টের অনুশীলনে। সাপ্তাহিক কাজের অন্যদিনগুলি তিনি নিজেকে নিয়োজিত করবেন এই পারফরমিং অ্যাক্টির প্রতি। তার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে সংস্থার সিইও খানিকটা চমৎকৃত হলেও, লিণ্ডার মানসিক জোর এবং আগ্রহ দেখে তার এই শর্তে রাজি হন। লিণ্ডা কেবল সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবার অফিসে যাওয়া শুরু করেন এবং সপ্তাহের বাকি দিনগুলি প্রশিক্ষণ লাভ এবং প্রশিক্ষক হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করেন সার্কাস অ্যাক্টে। পেশা ও প্যাশন দুটোর মধ্যে এই ভারসাম্য বিধান সম্ভব হয়েছে লিণ্ডার কর্তৃপক্ষের নমনীয় ও সহযোগী মনোভাবের জন্য তাই তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। অফিসের কাজে যে চাপ ও টেনশন তার থেকে তিনি অনেকটা মুক্ত হতে পারেন যখন এরিয়াল অ্যাক্টের ক্লাশ করেন আর ছোটদের প্রশিক্ষণ দেন। জাগতিক লাভ অর্থাৎ মোটা অঙ্কের মাইনে অপেক্ষা লিণ্ডা সুজার মত মানুষের কাছে সৃজনশীল ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে মানসিক তৃপ্তির বিষয়টি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই কর্পোরেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অবলীলায় উপেক্ষা করে তিনি মুক্তির পথ খোঁজেন তার নিজস্ব এরিয়াল অ্যাক্ট স্টুডিওতে যখন ২০ ফিট উঁচুতে শূন্যে ঝুলে থাকেন একে অন্যের উপর ভর করে।

শেষে বলব এমন একজন মানুষের কথা যিনি পেশায় আদতে ছিলেন একজন চিত্রগ্রাহক, কিন্তু ভারতীয় সার্কাসের সঙ্গে তার এক নিবিড় যোগ গড়ে ওঠে এবং দীর্ঘ সতেরো-আঠারো বছর এ'দেশীয় সার্কাস জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক, সখ্য অটুট ছিল। এই বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহকের নাম মেরি অ্যালেন মার্ক। চিত্রগ্রহণই ছিল মেরীর নেশা এবং পেশাও বটে। কিন্তু এই পেশার সুবাদেরই কীভাবে যেন জড়িয়ে গেছিলেন ভারতীয় সার্কাসের সঙ্গে। ১৯৬৯ সাল। মেরী প্রথমবার এসেছেন ভারতে। উঠেছেন বোম্বাই-এর (অধুনা মুম্বাই) এক বন্ধুর বাড়িতে। সেবার মুম্বাই-এর চার্চ রোডে বসেছে সার্কাসের প্রদর্শনী। মেরী তার বন্ধুর সঙ্গে দেখতে গেছেন শো-টি। এমন নির্মল বিনোদনে উচ্ছ্বসিত মেরী। সার্কাসের হিপোপটেমসের দুর্দান্ত সব ক্রিয়াকলাপ দেখে তারা তো মুগ্ধ। সেদিনের সেই শো ভারতীয় সার্কাস সম্পর্কে মেরীর মনে একটা ভাল লাগা তৈরি করল। আগ্রহ জন্মালো তার এই বিশেষ বিনোদনী

ঘরানাটির প্রতি। কিন্তু কীভাবে জানবেন তিনি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনদের সম্পর্কে কারণ ইংরাজি এ'দেশে দ্বিতীয় কাজের ভাষা রূপে স্বীকৃত। অধিকাংশ মানুষই কথা বলেন হিন্দীতে তবে সার্কাস মালিক কিংবা প্রশিক্ষকেরা অনেকেই ইংরাজিতে কথা বলতে পারেন। মেরীর আরো একটু সুবিধা হল যে, ভারতবর্ষে এসে তার পরিচয় হল দয়ানীতা সিং নাম্নী এক অল্পবয়সী মহিলা চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে। সার্কাসের মানুষজন সম্পর্কে জানার জন্য সাক্ষাৎকারে দয়ানীতা হিন্দীতে কথোপকথনের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে দিতেন। পরবর্তী সময়ে পুরো সাক্ষাতকার-এর বিষয়বস্তুটি মেরী, তার স্বামী মার্টিন বেল এবং দয়ানীতা যৌথভাবে ইংরাজিতে অনুবাদ করে নিতেন। এই দেশের নানা বিষয় সম্পর্কে জানার অগাধ আগ্রহ ছিল মেরীর। ১৯৬৯ সালে প্রথমবার ভারত দর্শনের পর পরবর্তী কুড়ি বছরে তিনি বারে বারে ফিরে এসেছেন এ'দেশে এবং কাজ করেছেন ব্যতিক্রমী কিছু বিষয় নিয়ে। যেমন মুম্বাই-এর যৌনকর্মীদের নিয়ে লিখেছেন 'Folkland Road' নামক একটি বই। অন্যদিকে আবার দিল্লী ও মুম্বাই-এর স্ট্রীট পারফরমরদের' নিয়ে তিনি গবেষণাধর্মী কাজও করেছেন। মেরীর দ্বিতীয় বইটি যেটি ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে রচিত সেটি হল 'Mother Teresa's Missions of Charity in Clacutta'। তবে মেরী যতবারই ভারতবর্ষে এসেছেন প্রতিবারই চেষ্টা করতেন কোনো সার্কাস প্রদর্শনী কোথাও চলছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নিতে সে খোঁজ পেলেই ছুটে যেতেন সেই প্রদর্শনীতে চিত্রগ্রহণের জন্য। শুধু চিত্রগ্রহণই নয় বিভিন্ন সার্কাসের শিল্পীদের সার্কাস ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করেছেন মেরী। গতশতকের সাতের দশকের সূচনাকালে, মেরী জেমিনি সার্কাসে বেশ কিছু চিত্র সংগ্রহ করেন। তবে সার্কাস এবং সার্কাসের মানুষজনকে নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য তার প্রয়োজন ছিল নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভারতবর্ষে থেকে সার্কাস নিয়ে কাজ করা। অবশেষে সে সুযোগ এল ১৯৮৯ সালে। সার্কাস-এর উপর তথ্যচিত্র (স্থির) নির্মাণের জন্য তিনি আর্থিক সহায়তা ও উৎসাহ পেলেন মারিয়ানে ফুলটন এবং জর্জ ইস্টম্যান হাউসসহ ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানির তরফে। শুধু তাই নয় National Endowment for the Art-এর তরফেও তাকে এ'কাজে উৎসাহিত করা হল।

মেরী জানতেন এ'ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়িত করা এক কঠিন কাজ। তার এ'কাজে সহায়াতা করার জন্য এগিয়ে এলেন দয়ানীতা সিং। ভারতীয় সার্কাসের উপর স্থির তথ্যচিত্র নিমার্ণের কাজ মেরী অ্যালেন মার্কের পূর্বে কোন বিদেশী করেনি। সার্কাসের দুর্ভেদ্য ভূমিতে প্রবেশ করা কাজ করা মেরীর কাছে ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তার ওপর মহিলাচিত্রগ্রাহক। সার্কাস কোম্পানিগুলি সম্পর্কে বেশ কিছু অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সাজিয়ে দিলেন দয়ানীতা সিং। ২০-২৫টি বড় সার্কাস কোম্পানি সেই সময় সক্রিয় থাকলেও অনেক ছোট ছোট কোম্পানিও স্থানীয়ভাবে জন্ম নিয়েছিল। ফলে আগে থেকে একটা নেটওয়ার্ক না করা থাকলে তাদের কাজের পক্ষে অসুবিধা হত। ভ্রাম্যমান এইসব ছোট বড় কোম্পানিগুলি একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রদর্শনীর জন্য ঘুরে বেড়াতো ফলে কোন একটি অঞ্চলে তাদের স্থায়ীত্বকাল ছিল সর্ব নিম্ন দু-সপ্তাহ ও সর্বোচ্চ দু-মাস । মেরী এবং দয়ানীতা বুঝতে পারেন, চালু কোম্পানিগুলির মধ্যে রয়েছে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফলে তারা প্রত্যেকেই তাদের পরবর্তী প্রদর্শনী ক্ষেত্র সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রাখত। কোন এক কোম্পানি অন্য কোম্পানির প্রদর্শনীস্থল আগাম জানতে পারলে তারা যদি সেখানে পৌঁছে যায় সেই আশঙ্কাতেই এই গোপনীয়তা। ফলে মেরী ও দয়ানীতার পক্ষেও আগাম জানা সম্ভব ছিলনা কোন কোম্পানির পরবর্তী প্রদর্শনী ক্ষেত্র সম্পর্কে। শুধু তাই নয় কোম্পানি তার নিজস্ব পারফরমার এবং খেলাগুলি নিয়েও অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে চলত। অন্য কোম্পানি যাতে কোন পারফরমারকে ভাঙিয়ে বা কোন আইটেম চুরি করে না নেয় সে দিকে কর্তৃপক্ষের সবসময় একটা নজরদারি চলত। ফলে সার্কাসের অন্দরে বহিরাগত প্রবেশ ছিল এক কঠিন ও জটিল ব্যাপার। কিন্তু মেরী এমন এক কর্মপ্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন যে, সার্কাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করলে তার কাজ সম্পন্ন হতনা। প্রদর্শনীর স্থান, কাল জানা তার পক্ষে ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোথায় কখন কতদিনের জন্য একটা সার্কাস প্রদর্শনীর তাঁবু পড়বে তার জন্য কোম্পানি সেই অঞ্চলের চাহিদা, পরিবেশ, স্থানীয় মানুষের অন্যান্য বিনোদনের উৎস, অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়া সম্পর্কে বিশেষ খোঁজ খবর নিতেন আগাম। শুধু তাই নয় ওই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ, এমনকী ওই অঞ্চল এবং অঞ্চলের

আশেপাশে অন্য কোন সার্কাস প্রদর্শনী চলছে কিনা সে বিষয়েও বিস্তারিত খোঁজ নিয়েই অন্য কোন কোম্পানি তার তাঁবু ফেলত। জানা যায় বাংলারই এক সার্কাস কোম্পানি মেরী ও তার সহযোগীকে তাদের পরবর্তী প্রদর্শনিস্থল সম্পর্কে কোনরকম তথ্য দিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয় ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কায়। মেরীও নাছোড়বান্দা। তার অনুসন্ধিৎসু মন ঠিক বেনারস থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই কোম্পানিরিই তাঁবু ফেলার বিরাট একখানি গর্ত খুঁজে পান এক বৃহৎ ফাঁকা অঞ্চলে। তবে তারা সার্কাসটি ওখান থেকে চলে যাবার একদিন পর সেই স্থলে পৌঁছেছিলেন বেনারসে। তাই প্রদর্শনটি চালু অবস্থায় পাননি।

১৯৮৯-৯০ সালের এই সময়টা মেরী ও তার সহযোগীরা সারা ভারতব্যাপী ঘুরে মোট আঠারোটি কোম্পানির অভ্যন্তরে সার্কাস শিল্পী ও কোম্পানির বন্য জীবজন্তুগুলির প্রচুর চিত্র গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে বৃহৎ শহরে ঘুরে ঘুরে ছোট বড় সব ধরনের সার্কাস কোম্পানির ছবি তুলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেন মেরী। ভারতীয় সার্কাস সংস্কৃতির উপর কাজ করা এবং চিত্রগ্রহণ মেরী অ্যালেন মার্কের পেশাগত জীবনের এক দুর্লভ ও সুন্দর অভিজ্ঞতা। ভারতীয় সার্কাস ঘরানা একদিকে তার কাছে একপ্রকার স্বপ্নে দেখা ম্যাজিকের মত, অন্যদিকে তা আবার কঠিন সুন্দর এবং নিষ্ঠুর বাস্তবও, যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহুমানুষের জীবনের ঝুঁকি। ভারতীয় সার্কাস তার কাছে যেন বহুবিধ বৈচিত্র্যে সমাহার। যেখানে নির্মমতার সঙ্গে লুকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যও। তাই সেই দৃশ্যমান কঠিন অথচ সুন্দর বাস্তবকে বোঝার জন্য মেরী বারে বারে এসেছেন এ'দেশে। ১৯৯২ সালে স্বামী মার্টিন বেলের সঙ্গে তিনি পুনরায় এলেন ভারতবর্ষে। এই সময় তিনি "The National Geographic Television Explorer"-এর জন্য একটি ছবি তৈরি এবং প্রযোজনার কাজ হাতে নিয়েছিলেন। ছবিটির নাম "The Amazing Plastic Lady"। এই ছবিটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সার্কাসের জন্য নিবেদিত এক প্রশিক্ষক প্রতাপ সিং ও তার দশ বছরের শিক্ষানবীশ অ্যাক্রোবাট পিংকী ও ট্রুপের ছেলে মেয়েদের নিয়ে। প্রতাপ সিং ও তার ট্রুপের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাময়ী শিশু শিল্পী পিংকীর সঙ্গে তার শিক্ষাগুরু প্রতাপের সম্পর্ক নিয়েই কাহিনি এগোয়। এই ছোট্ট পিংকীকেই সেই সময় 'plastic lady' নামে ডাকা হত তার শারীরিক দক্ষতা ও স্থিতিস্থাপকতার জন্য। পিংকী ও প্রতাপের সঙ্গে পূর্বেই মেরীর আলাপ হয়েছিল, যখন প্রাথমিক ভাবে তিনি সার্কাসের উপর চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু করেন। 'গুরু-শিষ্য পরম্পরায়' এই ধারাটি একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হিসাবে উঠে আসে মেরীর মনে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের যে ধারাবাহিক ঐতিহ্য ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ সেটিকে মাথায় রেখেই মেরী এই ছবিটি নির্মাণের কাজে এগিয়ে আসেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি সার্কাস শিল্পীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজটিও সেই সময় পাশাপাশি চলতে থাকে।

ভারতীয় সার্কাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একজন চিত্রগ্রাহক হিসাবে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সার্কাসের সংস্কৃতির মধ্যে একটা ফারাক খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি সেটি হল ভারতীয় সার্কাসের সহজ, সরল আবহাওয়া। চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের চাপে পাশ্চাত্যে এই innocence ধরে রাখা সম্ভব ছিলনা তখন। তাই ভারতীয় সার্কাসের বাতাবরণ মেরীর কাছে অনেক বেশী প্রাঞ্জল ও সুন্দর মনে হয়েছে। পরিবর্তিত আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে সেই পুরোনো সহজ সরল আঙ্গিক ভারতীয় সার্কাসের ক্ষেত্রেও যে আর বজায় থাকবে না, মেরী তা অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সার্কাস সংস্কৃতি তখন প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়েই বাঁচার চেষ্টা করেছিল। ১৮৮০ সালে ইউরোপীয় বিনোদনী চর্যায় সার্কাসের আবির্ভাব হলেও বিশশতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সেখানে সার্কাসের সংস্কৃতির ছন্দপতন হয়। পঞ্চাশটি বৃহৎ কোম্পানি ক্রমে কমতে কমতে ২০-২৫ টাই এসে দাঁড়ায়। ইউরোপ আমেরিকার মত এ'দেশেও গত শতকের নয়ের দশকের সূচনা কাল থেকেই এই শিল্পের অবনতি ঘটতে শুরু করে। পুরোনো ধারার বিনোদন রূপে সার্কাসের গ্রহণযোগ্যতা কমতে শুরু করে জনমানসে। মেরীর সহযোগী দয়ানীতা সিং তাদের প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার জন্য সেইসময় বহু কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন যে এই কাজটির মাধ্যমে তারা ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম অনুষঙ্গরূপে সার্কাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন, যা কোম্পানীর জন্য ইতিবাচক প্রচারেরই কাজ করবে। দয়ানীতার আবেদনে

অনেক কোম্পানি আশ্বস্ত হয় এবং তথ্য সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করে। ভারতীয় সার্কাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার হয়েছিলেন মেরী ও তার সহযোগী।

১৯৮৯ সালে কেরালায় জেমিনি সার্কাসের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হয় মেরী অ্যালেন মার্কের। সাতের দশকের প্রাক্কালে জেমিনি সার্কাসের তাঁবুতেই প্রাথমিক ভাবে মেরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বন্য পশু প্রশিক্ষক পরিন্তল মান্না ও তার প্রশিক্ষিত শিম্পাঞ্জী রাজার সঙ্গে। এবার এসেও সেই রাজা ও পরিন্তল মান্নার খোঁজ পেলেন তিনি। জেমিনিতে রাজার খুবই কদর। সে যেন এই সার্কাসের স্টার আর্টিস্ট। 'রাজা' নামটি হিন্দীতে রাখা অর্থাৎ 'King'। সত্যিই কোম্পানি যেন তাকে রাজকীয় সম্মানে রেখেছে। প্রতিদিন প্রচুর অনুরাগী দশর্কের বদন্যাতায় সে পায় পছন্দসই নানা ফলমূল। মেরীকে এত বছর পর দেখেও চিনতে পারে রাজা। হাততালি দিয়ে তাকে অভিবাদন করে এগিয়ে এসে করমর্দন করে। চুম্বন করে তার ঊচ্ছাস প্রকাশ করে সে। কিন্তু মেরী জানতে পারেন আলসারের মত জটিল রোগে ভুগছে সে। ড: এম. এস. গোপালকে (পশু চিকিৎসক) মাদ্রাজ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তার চিকিৎসার জন্য। সার্কাসের সকলেই উদ্বিগ্ন রাজার জন্য। নয়-দশ জন সার্কাস কর্মী মিলে তাকে ধরে নিয়ে যায় খাঁচার কাছে চিকিৎসার জন্য। অবাধ্য হলে সার্কাসের হাতিটিকে নিয়ে আসা হয় তাকে ভয় দেখাবার জন্য। এই বৃহদাকায় পশুটিকেই সে ভয় পায় একমাত্র। মেরী বলেন, রাজার সঙ্গে মানুষের ফারাক কেবল একটা জায়গায়। সে কথা বলতে পারেনা। এছাড়া বাকি সমস্ত আচরণ একেবারে পূর্ণবয়স্ক মানুষের মত। সার্কাসে এবং সার্কাসের বাইরে মহিলা দর্শকের মধ্যে রাজা অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাদের প্রতি রাজারও বিশেষ প্রগলভতা লক্ষ্য করা যায়। রিং-এর ভিতর মোটর সাইকেল নিয়ে জাম্প করা তার প্রিয় খেলা কিন্তু মেরী লক্ষ্য করেছেন দশর্কদের মধ্যে সাদা চামড়ার মানুষ দেখলে সে বিশেষ পছন্দ করেনা। ক্ষোভে আক্রোশে তার দিকে আস্ত মোটর সাইকেলটি ছুঁড়ে মারতে যায়। সেই রাজাই আবার প্রশিক্ষকের স্ত্রীকে খুবই সমীহ করে চলে। মেরী যখন জেমিনি সার্কাস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, রাজা হয়ত তার চলে যাওয়াটা বুঝতে পেরেছিল, তাই রিং-এর ভিতরেই সে অশান্ত হয়ে ওঠে। মেরীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎটা রাজার পক্ষে সুখকর হবেনা জেনেই সার্কাস মালিক আর প্রশিক্ষক মান্না মেরীকে রাজার খাঁচার কাছে যেতে নিষেধ করেন। মেরী চলে আসার কিছুদিনের মধ্যে রাজা মারা গিয়েছিল তবে শেষদিন পর্যন্ত সে তার মোটর সাইকেল জাম্পের শো টি করে যায়। সে রাতে অসুস্থ রাজার পাশে রাজার জীবনের শেষ অবধি ছিলেন সার্কাস মালিক জেমিনি শঙ্করন ও প্রশিক্ষক পরিন্তল মান্না। রাজা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শঙ্করন আজও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। মেরী বুঝেছিলেন, রাজা জেমিনি সার্কাসের আর পাঁচটা সাধারণ সদস্যের মতই ছিল। রাজার মৃত্যু তাই এই সার্কাসের সকল স্তরের মানুষকে ব্যথিত করে তুলেছিল। একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছিল রজার মৃত্যুতে। শুধু চিত্রগ্রহণ নয় সার্কাস জীবনের অন্দরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছিলেন মেরী সার্কাসের মানুষ না হয়েও। তাই তাদের জীবনের আনন্দ দু:খের অনুভূতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তার অনুভবও। ভারতীয় সার্কাস নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে মেরী অ্যালেন মার্ককে। চিত্র গ্রহণের পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করেছেন সার্কাস মানুষদের দিন যাপন। স্যাক্সাফোন আর ড্রামের সুরে বিদেশী ছন্দ আর তালকে যখন সার্কাসের যন্ত্র শিল্পীরা ধরার চেষ্টা করতেন এক-একটা আইটেমে সে সুর বাজত মেরীর কানে। কোথাও আবার তাঁবুর ভিতরে ক্ষুদে পারফরমারদের কোলাহল হাসি ঠাট্টাও উপভোগ করতেন তিনি। অথবা সার্কাস ক্লাউনদের পারস্পরিক বিবাদের সাক্ষীও থেকেছেন তিনি। তাঁবুর ছোট্ট ঘরে কোন শিল্পীর নিষ্ঠাভরে ঈশ্বর উপাসনাও মেরীর নজর এড়াইনি। শুধু ছবিতে নয়, সার্কাসের চলমান জীবনকে তিনি সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর তার মধ্যে বিশেষ কোন ভাললাগা মুহূর্তকে ক্যামেরায় লেন্সবন্দী করতে চেয়েছেন। সার্কাসের অন্দরের টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলিই মেরী সাজিয়েছেন *Indian Circus* বইটিতে। আর সার্কাস শিল্পীদের সঙ্গে কথোপকথনের কিছু অংশ তিনি ব্যবহার করেছেন। তারই প্রযোজিত "The Amazing Plastic Lady" চলচ্চিত্র নির্মাণে। এই সিনেমার মুখ্য চরিত্র পিঙ্কির গ্রামেই ছবির অনেকগুলি দৃশ্য গৃহীত হয়। পিঙ্কির মার সঙ্গে গৃহীত সাক্ষাতকারে জানা যায় মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই পিঙ্ককে চুক্তির ভিত্তিতে তার মা কোম্পানির কাছে তুলে দেন। এমন আরো অনেক অজানা কাহিনি সঞ্চিত হয়েছিল

এই চিত্রগ্রাহকের ঝুলিতে। দীর্ঘ কথোপকথনের রেকর্ডগুলি তিনি পরবর্তীকালে দয়ানীতার সাহায্যে অনুবাদ করেন। প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি তাঁর বই ও চলচ্চিত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন যথার্থভাবেই। ভারতীয় সার্কাসের প্রতি মেরী আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এমন একটি সনাতনী বিনোদনী ঘরানা এবং এই ঘরানার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে গেছেন। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন যে ভারতীয় সার্কাস তাঁকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। একজন বিদেশী মহিলা যিনি পেশায় চিত্র সাংবাদিক, তথ্যচিত্র গ্রাহক, ভারতীয় সার্কাসকে নিয়ে তাঁর এই সুগভীর চর্চা ও অনুভব ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অসামান্য অবদান। ভারতীয় সার্কাস তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে কিনা জানা নেই, রেবা রক্ষিতের মত শিল্পীরও হয়ত পুর্নজন্ম হবেনা কিন্তু মেরী অ্যালেন মার্কের কাছে আমরা চির ঋণী হয়ে থাকব তাঁর এই অধ্যাবসায় এবং কীর্তির জন্য।

পাদটীকা:

১। ড: বাঁধন সেনগুপ্ত, **'ইন্দুবালা',** দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।
২। ঐ, পৃ: ১৮।
৩। ঐ, পৃ: ২১।
৪। www.kolkataonwheels.com
৫। অবনীন্দ্র কৃষ্ণ বসু, **'বাঙালীর সার্কাস',** গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৩।
৬। কৃশানু ভট্টাচার্য, 'বিদায় বাঙালি ব্যায়ামবীর', **আনন্দ বাজার পত্রিকা,** ২৯শে মার্চ, ২০১৪।
৭। অবনীন্দ্র কৃষ্ণ বসু, **'বাঙালীর সার্কাস',** গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৩, পৃ: ১১৫।
৮। ঐ, পৃ: ১১২ - ১১৬।
৯। Sreedharan Champad, **'An album of Indian Big Tops',** Strtegic Book Publishing and Rights Co., Houston, 2013, p. 14-15.
১০। ঐ, পৃ: ৫ - ৮।
১১। ঐ, পৃ: ৫ - ১৫।
১২। ঐ, পৃ: ১৪ - ১৫।
১৩। ঐ, পৃ: ১৯।
১৪ । ঐ, পৃ: ১৪ - ১৫।
১৫। ঐ, পৃ: ১১৯ - ১২০।
১৬। ঐ, পৃ: ১১৯ - ১২০।
১৭। ঐ, পৃ: ১১৯।
১৮। ঐ, পৃ: ১২০।
১৯। ঐ, পৃ: ৭১ - ৭২।
২০। ঐ, পৃ: ১৯।
২১। এই সময়, 'রবিবারোয়ারি', ৮ই মার্চ, ২০১৫।
২২। ঐ, সংস্করণ।
২৩। ঐ, সংস্করণ।
২৪। বিকাশ মুখোপাধ্যায়, 'ছেলে যেন দাদার মত হয়', আজকল, ১৮ই জানুয়ারি, ২০১৫।
২৫। ঐ সংস্করণ।